ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মান্তরবাদ

রহস্য ও রোমাঞ্চ

উপস্থাপক

জ্যোতির্ম্ময় দাশ

অপরূপা

প্রকাশক :
অপরূপায় [illegible]
পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩, কালীকুমার ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-২

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৬৩

মুদ্রাকর :
শঙ্করকুমার দে
শ্রীমা মুদ্রণ
৮ বি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭

জন্মান্তরবাদ

রহস্য ও রোমাঞ্চ

এক

আত্মা অবিনশ্বর--এ বিশ্বাস আমাদের বেদ উপনিষদ অথবা পুরাণে বহু আলোচিত বিষয়। ভারতীয় ধর্ম সাধনায়, প্রধানতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মালম্বীদের কাছে এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও অনেক আছে। আমাদের দেশের সাধু-সন্তেরা যৌগিক-বলে পূর্ব জীবনের এবং আরো অতীত জন্মের ইতিকথা বলতে পারেন এবং বলেছেনও। বেদ উপনিষদের সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের কথা বাদ দিলেও গৌতম বুদ্ধের জাতক কাহিনীগুলি প্রমাণিত করে যে মানব জীবন বহু জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে আসছে।

কৌতূহলী মনে এর পরে কতকগুলো প্রশ্ন এসে জমা হয়---পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর কি শুধু নিছক গল্পকথা না বাস্তব সম্ভাবনা মানব জীবনের মরদেহ বিনাশের পর কোন অস্তিত্ব থাকে কি? থাকলে কি ভাবে থাকে। কোন্ সূক্ষ্মপথে মৃত্যুর পরেও পূর্বজীবনের স্মৃতি বছরের পর বছর বিচরণ করে এবং কিভাবে অনুভাবী বিগত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে?

প্রশ্নগুলিকে নিছক হেঁয়ালী বা বিভ্রান্তিকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, যৌগিক সাধনা বা আধ্যাত্মিক চর্চা না করেও নিজের বিগত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে এমন অনেকের খবর প্রায়ই সংবাদ পত্রের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও কেউ কেউ

অদূর ভবিষ্যতের ঘটনার কথা পূর্বাহ্নে অনুভব করতে পারেন, অনেকে আবার সুদূর ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তারও পূর্বোল্লেখ করেন। জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ও অধ্যক্ষ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত পনেরো বছর ধরে পুনর্জন্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সন্ধানে গবেষণা করে চলেছেন। উপরের ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পেতে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র একধিকবার ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং তত্ত্ব ও তথ্যের এক বিপুল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন।

মনস্তত্ত্ব বা মানবমনোবিজ্ঞানের প্রধানতঃ তিনটি শাখা :

(১) স্বাভাবিক, (২) অস্বাভাবিক ও (৩) পরা স্বাভাবিক।

প্রথম দুটি বিষয়ের জন্য বিজ্ঞান মহলে যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় শাখাটির জন্য বিশেষ কিছু আলোচনা হওয়া দূরে থাক বিজ্ঞান সমাজে এটি এতকাল উপেক্ষিতের দলে ছিল। পরামনোবিজ্ঞানীরা এই তৃতীয় শাখাটিকেই তাঁদের গবেষণার বিষয় করেছেন। পরামনোবিদ্যার (Parapsychology) বিষয়বস্তু হল মানব মনের সেই অশারীরিক বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যাহীন এবং তার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ব্যাখ্যার অনুসন্ধান।

আধুনিক বিজ্ঞান এই অপ্রাকৃত ঘটনাগুলির কোন নির্ভরযোগ্য কারণ দেখাতে পারে নি। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় আজ একথা মানতে সকলেই বাধ্য হয়েছেন যে অন্য ব্যক্তির চিন্তা উপলব্ধি করা (Telepathy), ভবিষ্যৎ-বাণী করা (Precognition or Prediction), দূরবর্তী ঘটনার অন্যত্র তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শন (Clairvoyance) অথবা জন্মান্তরের স্মৃতি স্মরণ করার মত অতিমনের (Extra Cerebral) ক্ষমতা কিছু কিছু লোকের আছে। মনস্তত্ত্বের এই আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যেরই বাস্তব ব্যাখ্যার বা বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানই পরামনোবিজ্ঞানের অনুধ্যেয় বিষয়।

উপরে লিখিত বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব (Extra Sen-

sory Perceptio 1) বলা যেতে পারে। কেননা, আমাদের জানা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এর কোন অবস্থাটিকেই অনুভব করা যায় না। এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব বিষয়টি কি ? কি করে এ অনুভূতি মানুষের আসে ? শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কেমন ধরণের হলে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব হয় ? এমন কতকগুলো মূল প্রশ্ন সামনে রেখে পরামনো-বিজ্ঞানীরা মানব মনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করছেন।

মানসিক চেতনাকে পরামনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে তিনটি ধারায় প্রবাহিত বলতে চেয়েছেন—(১) জাগ্রত সচেতন অবস্থা (Waking Consciousness), (২) স্বপ্নাচ্ছাদিত সচেতনতা (Dream Consciousnes) এবং (৩) অবদমিত সচেতন অবস্থা (Sub-Cousciousness)। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব এই তিনটি স্তরেই হতে পারে। আলাদা আলাদা তিনটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে প্রাঞ্জল করা চলে।

জাগ্রত সচেতন ব্যবস্থা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুর দিকে জনৈক আহত সৈনিককে তার বাসস্থান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এক হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। সৈনিকটি তার স্ত্রীর সঙ্গে দৈনিক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতো। কোন একটি দিনে স্বামীর চিঠি না আসায় স্ত্রীর মানসিক অবস্থাটি তার নিজের জবানীতে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ "সন্ধ্যে বেলা আটটা নাঁগাদ আমি তখন আমার বাইরের ঘরে একলা বসে রয়েছি, হঠাৎ কেমন এক চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। আমার অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে চলল, আমি ঘরের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলাম। কেমন যেন মনে হতে লাগল, আমার স্বামীকে নার্সিং হোমে একটা টেলিফোন করি। কিন্তু টেলিফোন আমি করতে পারলাম না। কারণ যুদ্ধের সময় অনর্থক টেলিফোন লাইনকে ব্যস্ত করা কর্তৃপক্ষের নিষেধ ছিল। প্রায় আধঘণ্টা অত্যন্ত

দোটানার সঙ্গে টেলিফোনের পাশে পায়চারি করার পর আমি অনেকটা সহজ হলাম এবং বসবার ঘরে ফিরে এলাম। আমার মেয়ে কাজ থেকে বাড়ী ফিরতেই আমি তাকে আমার সেই মানসিক অবস্থার কথা জানালাম। এবং বললাম, কাল তোমার বাবার চিঠি পেলে তিনি ভালো আছেন জানলে বাঁচি। পরের দিন আমি দুটো চিঠি পেলাম। একটি ঐদিনের এবং অন্যটি গত দিনের না পাওয়া চিঠি। সেটিতে তিনি লিখেছেন, 'বাড়ীর জন্য বড্ড মন কেমন করছে। কালকে রাত্রে আমায় টেলিফোন কোরো। আমি আটটা থেকে সাড়ে আটটা টেলিফোনের ধারে অপেক্ষা করবো।' উনি আশা করেছিলেন চিঠিটা আমি সন্ধ্যের মধ্যেই পেয়ে যাবো। পরদিন আর একটা চিঠি পেলাম, আমার উদ্বেগের প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পরে। 'তুমি আমায় ফোন করলে না কেন? আমি আটটা থেকে সাড়া আটটা পর্যন্ত কি উৎকণ্ঠায় যে অপেক্ষা করেছিলাম, কখন তোমার গলা শুনতে পাবো'।"

ঘটনাটি ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত একটি বিবরণী থেকে তুলে দেওয়া হল। দূর থেকে অন্যের চিন্তাধারা অনুভবের (Telepathic experience in waking state) উদাহরণ হিসাবে এটি গ্রহণীয়। Telepathy হল অন্যের চিন্তাকে ইন্দ্রিয়াতীত পথে অনুভব করা। ইন্দ্রিয়ের পথ না ধরেই একের চিন্তাধারা অন্যের মনে পৌঁছতে থাকে। আজও জানা যায়নি এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবীর ভূমিকা সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়। আর এও জানা যায় নি, এক মন থেকে আর এক মনে চিন্তাধারার এই স্বচ্ছন্দ গমনে কোন অ মানসিক মাধ্যম কাজ করে কিনা। এ বিষয়ে আমাদের জানা একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পুজারী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রাণী রাসমণিকে সর্বসমক্ষে চপেটাঘাত করেন এবং ভৎসনা করে জানান যে সাংসারিক চিন্তার যথার্থ স্থান কালীমন্দির নয়। রাণী রাসমণি নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং এ শাস্তি তাঁর উচিত পাওনা বলেই মনে করে নিয়েছিলেন।

স্বপ্নাচ্ছাদিত সচেতনতা

জনৈক যুবক তার মার সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ী থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে এক হোটেলে রাত কাটাচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে সে পরিষ্কার স্বপ্ন দেখে যে তাদের বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ভীতচকিত-চিত্তে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে তৎক্ষণাৎ জামা কাপড় পরে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য তৈরী হয়। তার মা বারবার নিষেধ করেন যেতে হবে না বলে। কারণ, স্বপ্ন কখনো সত্যি হতে পারে না। কিন্তু যুবকটি কোনো কথা না শুনে অত্যন্ত দ্রুত গাড়ী চালিয়ে বাড়ীতে এসে পৌছয়।

তার ভয়ই সত্য। বাড়ীতে রীতিমত বেশ আগুণ লেগেছে। গ্যারেজের ঘরটা পুড়ে ছাই। এবং গ্যারেজ থেকে আগুন বসত বাড়ীর দিকে এগোচ্ছে। প্রতিবেশী লোকজনের সহযোগিতার ফলে সে যাত্রায় যুবকের বাড়ীটা রক্ষা পায়।

ঘটনাটি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শনের (Clairvoyance in dream state) দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। Clairvoyance বা স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শন অনেকটা টেলিভিশন দেখার মত ব্যাপার। টেলিভিশনে যেমন দর্শক দূরবর্তী ঘটনার ছবি প্রত্যক্ষ করে থাকে তেমনি এখানে অনুভাবী ভবিষ্যতের ঘটনা নিজের মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পায়। টেলিভিশনের কার্যকারণ আমাদের জানা আছে। কিন্তু Clairvoyance-এর মাধ্যম আজও পরামনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

অবদমিত সচেতন অবস্থা

জনৈক ব্যবসায়ীকে কয়েক সাপ্তাহের জন্য একা বিদেশ ভ্রমণে যেতে হয়। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কেউ সঙ্গে যেতে পারেনি। যাবার অল্প কিছুকাল পরেই একদিন তাঁর স্ত্রী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অর্থাৎ অর্দ্ধসচেতন অবস্থায় দেখতে পেলেন তাঁর স্বামী হাসপাতালের

কেবিনে শুয়ে আছেন, হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রথমে ভদ্রমহিলা তাঁর এই অর্দ্ধসচেতন মনের কল্পনাকে অলীক স্বপ্নবিলাস ভেবে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরপর দু-তিন দিন এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় তিনি কিছুটা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। স্বামীর খবরাখবর নেবার জন্য তিনি তাঁর স্বামীর অফিসকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে না পারায় অফিস কোন খবর দিতে পারে না। এর তিন চার দিন বাদে ভদ্রলোক ফিরে আসতে দেখা গেল তখনও তাঁর দেহের নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এয়ার পোর্টে আসার পথে কায়রো বিমান বন্দরের কাছে তিনি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। পরে জানা যায় হাসপাতালে ভর্তির দিন আর স্ত্রীর স্বপ্ন দেখার দিনটি একই দিন ছিল।

হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও এবং বিন্দুমাত্র কোন খবর না পেয়েও তাঁর স্ত্রী অর্দ্ধসচেতন মনে একাধিকবার স্বামীর অসুস্থ অবস্থার ছবি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। এধরণের অনুভূতিকে Psychic experience in psychogenio state বলা হয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত তিনটি ঘটনাই clairvoyance-এর বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টান্ত বলবো আমরা। এই ঘটনাগুলির তাৎক্ষণিক খবর অনুভাবীরা একই সময়ে অন্যত্র অনুভব বা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু আগামী দূর ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে তাও অতিমনের অধিকারীরা আগেই বলে দিতে পারেন। এই ভবিষ্যৎবাণীও (Precognition or Prediction) উপরে লেখা মনের তিনটি স্তরেই অনুভূত হতে পারে। জয়পুরেই ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গবেষণাধীন একজন ভদ্রমহিলা আছেন। ১৫ই জুন ১৯১৫ সালে তিনি জানালেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে একটি গুরুতর রেল দুর্ঘটনা হবে। তার মাত্র কিছুকাল আগেই রেলওয়ে বোর্ড রেলপথের কার্যবিবরণীর আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, রেলপথে দুর্ঘটনা অনেক কমে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরো কম হবার

জন্য সকল রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভদ্রমহিলা জানিয়েছিলেন দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশী হবে এবং তিনি দুর্ঘটনার কারণ, সম্ভাব্য স্থান ইত্যাদি বিষয়ে মোট পনেরোটি তথ্য জানিয়েছিলেন। সেই পনেরোটি তথ্য সাইক্লোষ্টাইল করে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটনার অনেক পূর্বে বিতরণ করা হয়।

২১শে জুন সকালের কাগজে কোচিন এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনার সংবাদ ছাপা হয়। নিহতদের সংখ্যা দেওয়া হয় দশজন। ভদ্রমহিলাকে সে বিষয়ে জানান হলে তিনি বললেন, "নিহতদের সংখ্যা ভুল।" দুপুরের রেডিও-সংবাদে বলা হয় দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বাইশ। পরের দিন কাগজে জানান হল মোট মৃত্যু হয়েছে পঁয়ষট্টি জনের। ভদ্রমহিলার দেওয়া পনেরোটী তথ্যের মধ্যে চৌদ্দটি বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে পরামনোবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত প্রশস্ত পরিসরে কাজ শুরু করেছিলেন। সে সময় যা কিছু আপাত অলৌকিক ঘটনা, যেমন রূপায়ণ (meterialisati n) বা একটোপ্লাজম (ectoplasm) সবই এঁদের অনুধাবনযোগ্য বিষয় ছিল। কিন্তু অতি সম্প্রতি এঁরা নিজেদের সীমিত করেছেন সজীব দেহী মানুষের পরা-স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। তবে কখনো-সখনো নিতান্ত পরোক্ষ ভাবে বিদেহীরাও (যদি তেমন কিছু সত্যিই থাকে) এঁদের বিষয় বস্তু হয়ে পড়ে। এঁদের আপাতত তিনটি মুখ্য অনুধাবনযোগ্য বিষয় হল ESP (Extra Sensory Perception) বা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব। এতক্ষণ এই পর্যায়ের উপরে বিশদ আলোচনা ও উদাহরণ দেওয়া হল।

দ্বিতীয় হল P K (Psychokinesis বা মানসিব শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ) এবং তৃতীয় হল I A P (Incorporal Personal Agency বা দেহহীন ব্যক্তিক প্রতিনিধিত্ব।

PK বা Psychokinesis হল বহির্বস্তুর উপর মানবমনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা বস্তুর উপর মনের আধিপত্য। ESP ঘটনায়

মতই PK ঘটনায়ও কোন সহজগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। PK কখনো স্বতঃপ্রণোদিত কখনো বা মানুষের ইচ্ছাশক্তি নির্ভর। যীশুখৃষ্ট উত্তাল সমুদ্রে অশান্ত ঝড়কে এক মুহূর্তে শান্ত করেছেন; বিয়ে বাড়ীতে পানীয় জলকে মদে রূপান্তরিত করেছেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করেছেন, মূককে করেছেন মুখর, জরাগ্রস্তকে দান করেছেন নবযৌবন। এসবই PK এর নমুনা। ভারতবর্ষেও PK-র নমুনা কম কিছু নেই। আমাদের রামায়ণ মহাভারত এধরণের উদাহরণে ঠাসা। পিতার অভিশাপে মায়ের পেটে থাকাকালীন অষ্টবক্রামুনি কদাকার হয়ে গেলেন। আবার ঋষি অষ্টাবক্রের এক কথায় ভগীরথের বিকৃত দেহে সুকুমার সৌন্দর্য ফিরে এলো। বশিষ্ঠ মুনি চক্ষের নিমেষে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে ভস্ম করে দিলেন আর গৌতম মুনির অভিশাপে অহল্যা পাথর হয়ে গেলেন।

I P A বা Incorporal Personal Agency অর্থাৎ অদেহী ব্যক্তিক প্রতিনিধিত্ব হল মৃত্যুর পর মানুষের তথাকথিত দেহহীন রূপ। এর সঙ্গে দুটো জটিল প্রশ্ন জড়িয়ে আছে আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম। আত্মা এবং জন্মান্তর আমাদের কাছে পুরোনো কথা হলেও পরামনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আজ এর বাস্তব সত্যতা যাচাই করতে লেগেছেন। তবে এ প্রশ্নকে পাশ্চাত্য দেখছে মাধ্যমের (Mediumship) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ বন্দ্যো-পাধ্যায় দেখছেন Ecm (Extra cerebral memory) বা মস্তকাতীত স্মৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি অন্যান্য অপ্রাকৃত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করলেও প্রধানত পুনর্জন্ম বিষয়টির (ই-সি-এম সংজ্ঞাধীন) প্রতি বেশী আগ্রহশীল। তিনি এযাবৎ প্রায় ছ'শর কিছু বেশী জন্মান্তরের ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করার আগে আরো অনেক নতুন ঘটনা পরীক্ষা করে দেখতে তিনি আগ্রহী। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে এক্সট্রা সেরিব্রেল মেমরি (ই-সি-এম) কথাটি জন্মান্তরের ক্ষেত্রে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ই

চয়ন করেছেন। সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলে সমর্থন লাভ করেছে।

জন্মান্তরের বহু বিচিত্র ইতিহাস বা কেশ হিষ্ট্রী মানব মনের এক নবদিগন্তের পথ নির্দেশ করে এবং ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের মত নূতন সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকরা সে পথের দিশারী।

দুই

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এ পর্যন্ত প্রায় ছ'শর কিছু বেশী পরামনোবিজ্ঞান বিষয়ক কেস অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে তাঁর অনুসন্ধান পদ্ধতি ও পরবর্তী গবেষণা কাজের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

"কোন একটি ঘটনার খবর জানতে পেলে প্রথমেই আমি বিভিন্নভাবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হ'বার চেষ্টা করি যে অনুভাবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বিগত জীবনের কথা বলছে কিনা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির খবরাখবর অন্য উপায়ে হয়েছে কিনা। যদি অনুভাবীর বাইরে থেকে কোন প্রকারে মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ বা তার সম্পর্কে কিছু জানতে পারার অবকাশ না থাকে তাহালে ব্যাপারটাকে ECM-এর আওতায় পড়ে বলে মেনে নিতে হয়।"

সাধারণত ডঃ বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর সহকারীরা গোপনে বেশ সতর্কতার সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় লোকেদের যাচাই করে দেখে নেন। আত্মপ্রচার ও পয়সা রোজগারের ফিকিরে অনেকে মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে বলে থাকে।

অনুভাবীর জবানবন্দী নেওয়া ও বাস্তবের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখে নেওয়া অনুসন্ধানের প্রধানতম কাজ। অনুভাবীকে বেশীর ভাগ সময়েই তার পূর্বের জন্মস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সে মৃতের ঘর-বাড়ী ও অন্য সবকিছু সনাক্ত করতে পারে কিনা দেখা হয়। পূর্বে সে এখানে সে জায়গায় এসেছিল কিনা অথবা সে জায়গার কথা শুনেছিল কিনা তা ভাল করে নির্দ্ধারণ করে নেওয়া হয়। দুই দূরবর্তী দেশের ঘটনাগুলিকে সে কারণে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মোহিনীর[১] ঘটনাটি এধরনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এমন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী সন্দেহাতীতভাবে কেসটি সত্য বলে ধরে নিতে পারেন এবং অন্যদেশের (মৃত জীবনের) কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব অনুভাবীর উপর কার্যকর কিনা তা সমীক্ষা করে জানতে পারেন। অভ্যাস ও রীতিনীতির ব্যাপারে তিনি জনৈক বজরঙ্গ বাহাদুরের কাহিনী শোনালেন। বজরঙ্গ সব সময়েই কাঁটা চামচেতে খাওয়া দাওয়া করতো—অথবা তার বাড়ীতে ওসবের প্রচলন কোন দিন ছিল না। সে বাড়ীর বাইরে যাবার সময় সর্বদাই বন্দুক সঙ্গে রাখতে ভালবাসতো। বজরঙ্গের ধারণা পূর্ব জীবনে তার নাম ছিল আর্থার।

প্রাথমিক ভাবে কোন ঘটনাকে জন্মান্তরের ব্যাপার বলে মেনে নেবার পর অনুভাবীকে সম্মোহিত করে (হিপ্‌নোটিক রিগ্রেসিভ টেষ্ট) অতীতের কাহিনী আরো বিশদ ভাবে স্মরণে সাহায্য করা হয়। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে বিভিন্ন কাহিনী বলা হতে থাকে এবং সে নিজের কাহিনীগুলি সনাক্ত করতে পারে কিনা দেখা হয়। এই সময়ে অনুসন্ধানকারীর জিজ্ঞাসাবাদে অনুভাবী অনেক নূতন ঘটনাও বলে থাকে। সেই নূতন ঘটনাগুলিকে আবার মৃতের আত্মীয় স্বজনের কাছে যাচাই করে নেওয়া হয়।

বিভিন্ন ধরণের পুনর্জন্মের কাহিনীগুলিকে শ্রেণীভূক্ত করার ব্যাপারে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় তার নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতি মেনে চলেন। তিনি জানালেন—"আমার এ সম্মোহন পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশের পরামনোবিদদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রচুর পার্থক্য আছে। ওদেশে অনেক জটিল রীতিতে পরীক্ষা করা হয়। তাতে অনুভাবীর বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার ও গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। ঘটনার স্বাভাবিক তাৎপর্য মেনে নিয়ে অনুভাবীকে অতীত স্মরণে সাহায্য করলে তার বিভ্রান্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে।

১। কাহিনীটি পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

সমস্ত পরিসংখ্যান গ্রন্থিভুক্ত করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা হল 'টেলিপ্যাথিক টেষ্ট'। এই পরীক্ষায় জানতে চেষ্টা করা হয় অনুভাবীর পক্ষে অস্বাভাবিকভাবে বা অন্যের মানসগঠনের (ক্লেয়ার-ভয়েন্স) দ্বারা জন্মান্তরের খবর সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরণের পরীক্ষার একটা সর্বজনগ্রাহ্য কার্যকরী টেলিপ্যাথিক টেষ্ট এর পদ্ধতি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছেন।

গবেষণার তৃতীয় পর্যায়ে অনুভাবীর ব্যক্তিত্বের ধারা ও প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। তা থেকে ECM-এর কার্যকরণের মনস্তাত্ত্বিক সূত্রটি জানতে পারা যাবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ECM কেসগুলিকে মানুষের বিগত জীবনের কর্ম ও সংস্কারের মূল্যায়নে বিচার করা হবে। আমরা কি সত্যিই পূর্ব-জীবনের কর্মফলের অধিকারী হতে পারি, আমাদের পরবর্তী জীবন কি বর্তমান জীবনের পাপ পুণ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে? এ প্রশ্নের উত্তর ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার সাফল্যের উপর নির্ভরশীল।

তিনি জানালেন—"পুনর্জন্মের বিষয়টি খুব সরল ব্যাপার নয়। জন্মান্তরের ঘটনাকে এখনও যেমন অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা যায়নি তেমনি অবাস্তব বা ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায়নি। বিশেষ অধ্যবসায় ও সতর্কতার সঙ্গে এ ব্যাপারে গবেষণা করা প্রয়োজন। আমি বর্তমানে খোলা মনে বিষয়টি অধ্যয়ন করছি এবং এই মুহূর্তে চূড়ান্ত কোন কিছু মন্তব্য করার সময় আসেনি।"

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল: পূর্ব জীবনের স্মৃতি স্মরণের ক্ষেত্রে মস্তকাতীত মস্তিষ্ক (Extra Cerebral memory) মুখ্যত দায়ী? অথবা এর কোন অন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি সম্ভব?

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে পর্য্যন্ত ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মান্তরের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে ECM সংজ্ঞাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি জানালেন—"জীব বিজ্ঞানী বা পদার্থ বিজ্ঞানীরা 'জন্মান্তর' পুনর্জন্ম' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহশীল নন এবং

অনেকটা সেই কারণেই এ বিষয়ে কোন গবেষণা করার উৎসাহের পরিবর্তে এটিকে চর্চার অযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু ECM ও ESP প্রভৃতি সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করার পর দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন।" তিনি এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। তাঁর এই গবেষণার অগ্রগতি ও ফলাফলের প্রতি বৈজ্ঞানিক মহল এখন উৎসুক।

অবশ্য ECM সংজ্ঞাটি ব্যবহার করার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি আছে। রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্বর্গীয় ডঃ সম্পূর্ণানন্দ জ্যোতিষ ও ফলিত বিজ্ঞানের একজন মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মতে পূর্ব-জীবনের স্মৃতি-স্মরণ মস্তকাতীত স্মৃতির (Extra Cerebral) ব্যাপার নয় পক্ষান্তরে আমাদের স্বাভাবিক স্মৃতি-কোণের ব্যাপকতার ব্যাপার।

ECM কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের সূত্রপাত করেছে। পূর্বজীবনের স্মৃতিকে একক স্বাধীন একটি সত্তা হিসেবে মেনে নিলে তবেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব থেকে যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অতীত স্মৃতি দেহের মৃত্যুর পর দেহহীনভাবে কি করে বেঁচে থাকে ও পুনর্জন্মের দাবীদার বর্তমান অনুভাবীর স্মৃতির সঙ্গে কোন্ সূত্রপথে পরিবাহিত হয়ে সংযুক্ত হয়?

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া চলে না। তবে অধিকতম নির্ভরযোগ্য ধারণানুযায়ী এবং ভারতীয় শাস্ত্রমতে আত্মা শরীরের একটি উপাদান হলেও তা অবিনশ্বর। জীবের মৃত্যুতে জড়দেহের বিনাশের সঙ্গে তা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। খুব সম্ভবত স্মৃতিও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং পরে অন্য দেহে আশ্রয় নেয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে জন্মান্তরের অনেকগুলি আশ্চর্যজনক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে। নিউইয়র্কের মোহিনী বা চাঁদগাড়ীর মুন্নেশ প্রভৃতি ঘটনাগুলি ECM-এর বলিষ্ঠ উদাহরণ। সেগুলি পাঠ করার পর পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে মস্তকাতীত মস্তিষ্কের

(ECM) স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্যকরণের প্রভাবেই তারা সকলে বিগত জীবনের স্মৃতির অধিকারী হয়েছে।

অধ্যাপকের টেবিলের সামনে Purposive Philosophya-এর কর্ণধার উইলিয়াম ম্যাকডুগ্যালের (১৮৭১—১৯৩৮) একটি ছবি রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার প্রতি অধ্যাপকের নিষ্ঠা ও বিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধার যোগসূত্র খুঁজতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ম্যাকডুগালই প্রথম মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির বিশ্লেষণে শুধুমাত্র পদার্থ বিজ্ঞানকে মাঠকাঠি হিসাবে ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মানব জাতি কি কেবল একটি মহৎ যন্ত্র, শুধু উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্যহীন ভাবে কাজ করা ছাড়া তার অধিক কিছু নয়? ম্যাকডুগাল মনের লক্ষ্যমুখীন কার্যকরণের বৈশিষ্ট্য এবং জড়জগতের বিধি নিয়মের বাইরে বিচরণশীল মানসিক সত্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পদার্থ বিদ্যা ও জীববিদ্যার সঙ্গে আপোষহীন মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানব জীবনের অকল্পনীয় ক্ষমতা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে—যা কিনা মানব জাতিকে বর্তমান জড়জগতের নিয়মাধীন সীমানার বাইরে পৌছে দিতে পারে। জড়বাদী বিজ্ঞানের গবেষণার যেখানে শেষ ঠিক সেখান থেকেই পরামনোবিজ্ঞানের শুরু।

বিজ্ঞান মানব জীবনের সামগ্রিক সত্তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আজও দিতে সক্ষম হয়নি। মানুষের প্রকৃতি বিজ্ঞান যতটা অনুমান করতে পারে সেটা আসলে তার থেকেও অনেক বেশী জটিল ও গভীরতাময়। মৃত্যুর পরেও জীবন বা আত্মার অস্তিত্ব এবং অশরীরী ঘটনা সম্পর্কিত সমস্যাগুলির অনুসন্ধান কাযকে মনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও মানবিক সত্তার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি প্রকাশিত করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

অতীত জীবনের কথা মনে করতে পারে এমন অনেক অনু-ভাবীর কথা খবরের কাগজের পাতায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। জন্মান্তরবাদে যারা বিশ্বাসী তারা ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেয়। অন্য একদল আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়। আরো একদল আর একটু গভীরে চিন্তা করে দেখতে চেষ্টা করেন। সহজ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যাহীন এই কাহিনীগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন তাঁরা। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। এই অধ্যায়ে তাঁর সংগৃহীত অজস্র জন্মান্তরের কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল। ঘটনাগুলির চরিত্রেরা ভারতীয় ও অভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের।

চাঁদগাড়ীর মুনেশের কাহিনী

১৯৫৫ সালের কোন এক দিনের ঘটনা। চাঁদগাড়ী নামে এক অখ্যাত গ্রামের ছেলে মুনেশকে তার মা চান করাচ্ছিল। ছেলের দুষ্টুমি ও চঞ্চলতায় বিরক্ত হয়ে এক সময় মা এক চড় মারেন ছেলের গালে।

"আমাকে মেরো না বলছি," ছেলেটি প্রতিবাদ জানায়, "আমি এক্ষুনি তাহলে ইতরানীতে আমার নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবো। আমার নাম ভজন সিং, আমার বাড়ী আছে ইতরানীতে। সেখানে আমার বৌ, তিন ভাই, মা আর এক মেয়ে আছে। আমার নিজের বাড়ীতে কুয়ো খোঁড়া আছে। বাগান আর চাষের জমি ওপারে আলাদা রয়েছে।"

চার বছরের ছেলের এই মিথ্যে বাজে কথায় মা ভগবতী দেবী আরো চটে যান। মায়ের ধমকে সে তখনকার মত চুপ করে যায়।

কিন্তু ক্রমশঃ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পূর্ব জীবনের কথা বেশী বলতে আরম্ভ করে। তার স্কুলের সহপাঠীদের সে জানায় যে তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে বর্তমান, সে এক বৃহৎ পরিবারের কর্তা। বন্ধুরা বিশ্বাস করে না এবং মুনেশকে এ নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে থাকে।

ঘটনাক্রমে একদিন সে তার ঠাকুর্দাকে এই গল্প শোনায়। ঠাকুর্দা নেত্রপাল সিং ব্যাপারটিতে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি ইতরানী গ্রামের একটি লোকের কাছে ভজন সিং নামে কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে লোকটি জানায়, হ্যাঁ, সে নামে একজন ছিল।

ঠাকুর্দা ইতরানীতে গিয়ে খোঁজখবর করতে অল্প আয়াসেই জানতে পারেন ভজন সিং নামে একজন ১৯৫১ সালে কিছুদিন রোগ ভোগের পর স্বাভাবিক ভাবেই মারা যায়। তার স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান।

চাঁদগাড়ীর ধীরেন্দ্রলাল সিংএর স্ত্রীর গর্ভে মুনেশের জন্ম হয় ঠিক সেই বছরেই ১৯৫১ সালে।

ঠাকুর্দা ভজন সিংয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুনেশের কথা তাদের জানান। তারা মুনেশের সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। ভজন সিংয়ের এক ভাই ও শ্যালক ঠাকুর্দার সঙ্গে চাঁদগাড়ীতে মুনেশের সঙ্গে দেখা করতে এলে মুনেশ তাদের চিনতে পারে। মুনেশের চেহারা ও হাবভাবের সঙ্গে ভজন সিংয়ের অবিকল মিল দেখে তার ঐ আত্মীয় দুজনেও খুবই বিস্মিত হয়।

তাদের বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার সময় মুনেশ তার তথাকথিত ভাইকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, হাত ধরে থাকে। শেষে ঠাকুর্দা তাকে কয়েক দিনের মধ্যেই ইতরাণীতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিতে বালক মুনেশ শান্ত হয়।

ভজন সিংয়ের স্ত্রী অযোধ্যা দেবী বিসাড়া গ্রামে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কানেও মুনেশের খবর পৌঁছায়। কিছুটা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে তিনি তাঁর ননদের সঙ্গে চাঁদগারীতে আসেন। দুজনেরই চেহারা একহারা লম্বা এবং তাঁরা দুজনে একই ধরণের পোষাক পরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে মুনেশের কাছে দাঁড়ালেন।

মুনেশকে পরীক্ষা করার জন্যে তার জ্যাঠামশাই জিজ্ঞেস করলেন তাকে, "এর মধ্যে কে তোমার মা চিনতে পারো কী?" অবিচলিত কণ্ঠে মুনেশ জানায় এদের মধ্যে তার মা নেই, এরা তার স্ত্রী ও বোন। হঠাৎ ছেলেটি এগিয়ে এসে অযোধ্যা দেবীর হাত ধরে। অযোধ্যা দেবী কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, ব্যাপারটার মধ্যে কোন ছল চাতুরী আছে কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্য বললেন, "আমাকে কোন বিশেষ ঘটনা বল, যাতে আমি বিশ্বাস করতে পারি তুমি আগের জন্মে আমার স্বামী ছিলে।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মুনেশ বলে, "ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে আগ্রা থেকে ফিরে এসে শুনলাম তুমি মার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে, মার সঙ্গে তর্ক করেছিলে, আমি তাতে রেগে গিয়ে মাখন তোলার লাঠি দিয়ে তোমাকে মেরেছিলাম। লাঠিটা ভেঙ্গে গিয়েছিল।" এর পরে সে অযোধ্যা দেবীকে এমন কতকগুলি দাম্পত্য জীবনের গোপনীয় কথা বলে যা আমাদের দেশে কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় পুরুষের জানা সম্ভব নয়। অযোধ্যা দেবীর মনে আর কোন দ্বিধা থাকে না মুনেশকে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে। তিনি মুনেশকে একবার ইতরানীতে নিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

ইতরানীতে পৌঁছেই মুনেশ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ভগবতী প্রসাদকে নাম ধরে ডাকে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেও মুনেশকে তার পুরোনো বন্ধু ভজন সিং বলে মেনে দেয়। মুনেশ এরপরে সকলকে পথ দেখিয়ে সোজা তার বাড়ীতে গিয়ে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আনন্দে তার দুচোখে জল এসে যায়।

সে এবার তাদের বাড়ী ও জায়গা জমি ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে তার মৃত্যুর পর যা যা পরিবর্তন হয়েছে সব বলতে থাকে।

মনেশের ইতরানী আসার গল্প শুনে যারাই তার সঙ্গে সে সময়ে দেখা করতে আসে সকলেই তাকে জন্মান্তরিত ভজন সিং বলে মেনে নেয়। সে তৎক্ষণে তার নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, তার উইল, তার বাগান চারটে বলদ ও দুটো মোষকে সনাক্ত করে।

অযোধ্যা দেবী বিসড়ায় ফিরে যাবার পর বালক মুনেশ অত্যন্ত বিষণ্ণ ও কাতর হয়ে পড়ে। নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে বিসড়ায় গিয়ে দেখে আসার বাসনা বারবার প্রকাশ করে। তার ঠাকুর্দা বিসড়ায় নিয়ে যেতে রাজী হলে সে বিসড়া যাবার রাস্তাঘাট পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানায়। বিসড়ায় পৌঁছে সে একটি বাড়ীর সামনে হঠাৎ থেমে পড়ে জানায় সেইটি তার শ্বশুরবাড়ী এবং এও বলে যে সামনের দিকে একটি ঘর নতুন তোলা হয়েছে, তার মৃত্যুর সময়ে সেখানে কেবল উঁচু রোয়াক ছিল মাত্র।

ইতরানীর মত এখানেও মুনেশ তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলকে চিনতে পারে। নিজের মেয়েকে দেখে সে ভীষণ খুশী হয়ে ওঠে। মেয়েটির যখন মাত্র দু'বছর বয়স, সে সময়ে ভজন সিংয়ের মৃত্যু হয়েছিল। তাদের এই মিলন দৃশ্য যেমন করুন তেমনি মর্মস্পর্শী।

চাঁদগারীতে ফিরে এসে মুনেশ অত্যন্ত গম্ভীর ও চুপচাপ হয়ে যায়। কেবল তার আগের জন্মের পরিবারের কেউ এলে তাকে কিছুটা প্রফুল্ল হতে দেখা যেত। অযোধ্যা দেবী অপর আর একদিন মেয়ে নিয়ে এলে মুনেশ খুব খোশ মেজাজে বড়দের মত গল্প গুজবে মেতে ওঠে এবং তারা চলে যেতেই আগের মত গম্ভীর হয়ে যায় আবার। তাকে দেখে মনে হতে থাকে সে যেন বর্তমান জগতের কোন কিছুর সঙ্গেই জড়িত নয়; অযোধ্যা দেবীর সঙ্গে ভজন সিংয়ের মৃত্যু-পূর্ব জীবনে ফিরে যেতে পারলেই সে যেন সব থেকে বেশী সুখী হবে।

এই ঘটনা থেকে একটি মাত্র প্রশ্ন জাগে, ভজন সিং কি তাহলে মুনেশ রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে? আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্নের উত্তর সোজা হলেও একজন পরামনোবিজ্ঞানীর কাছে এর উত্তর খুব সরল নয়। এর বিজ্ঞান গ্রাহ্য উত্তর আজও তাঁর জানা নেই।

আগ্রার মঞ্জুলতার কাহিনী

আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণের বিশ্বাস কিন্তু আমাদের বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কিংবদন্তী আছে যে মিশরীয়েরা আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ পেছিয়ে দিতে বা বন্ধ করতে পারতো। গ্রীস দেশে পিথাগোরান সম্প্রদায়ের বিশ্বাসীরা আত্মার এক দেহ থেকে আর এক দেহে আশ্রয় নেওয়ার তথ্যটি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করতো। হিন্দুদের কাছে এই দেহান্তর গ্রহণ 'পুনর্জন্ম' হিসেবে পরিচিত এবং তাদের বিশ্বাস মানুষ নিজের কর্মফল অনুযায়ী পরবর্তী জন্মগ্রহণ করে।

এই চন্দ্রযানের যুগে বিজ্ঞানী মন বিষয়টাকে এভাবে মানতে চায় না। কিন্তু সুদূর অতীতের ও হালফিল বর্তমানের কিছু কিছু বিচিত্র ঘটনার বাস্তব প্রমাণে তারা কিছুটা বিচলিত। আগ্রার মঞ্জুলতার ঘটনা তেমনই এক বিস্ময়কর কাহিনী।

আগ্রার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীপি. এন. ভার্গবের পাঁচ বছরের মেয়ে মঞ্জুলতা। আড়াই বছরের বয়সের সময় সে প্রথম জানায় যে তাদের দুটো বাড়ী ছিল। বাড়ীগুলোর কিছুটা বর্ণনাও দেয় সে, জানায় তাদের বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি ছিল এবং ঘরগুলো খুব বড় বড়। প্রথমে কেউ এ সব কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ধুলিয়াগঞ্জের একটি বিশেষ বাড়ীর কাছে যখনই সে যে কোন উপলক্ষে আসতো, সকলকে ডেকে বলতো, সেটা তাদের বাড়ী। বাড়ী ফিরে গিয়ে সেই বাড়ীতে আবার যাবার জন্যে কান্নাকাটি সুরু করে দিত। মঞ্জু এখন কিছুটা স্পষ্টভাবে জানায় যে সে ঐ বাড়ীতে আগের জন্মে

ছিল। বাড়ীটির মালিকের নাম শ্রীপ্রতাপ সিং চতুর্বেদী, পেশায় উকিল তিনি।

মঞ্জুলতার মা একদিন তাকে সেই বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে সে অনেক কিছু জিনিষ নিজের বলে সনাক্ত করে। বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় জানা গেল শ্রীযুক্ত চতুর্বেদীর কাকীমা (ফিরোজাবাদের চৌবেকা-মোহাল্লার বাসিন্দা শ্রীবিশ্বেশ্বর নাথ চতুর্বেদীর স্ত্রী) ১৯৫২ সালে মারা যান। মঞ্জুলতা-রূপে তিনিই সম্ভবত আবার জন্মগ্রহণ করেছেন।

মঞ্জুকে ফিরোজাবাদে নিয়ে যাওয়া হলে সে তার বিগত জীবনের সঙ্গে পরিচিত অনেককেই চিনতে পারে। আর সেখানকার আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে চতুর্বেদীর স্ত্রী বলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

কিউবা দেশের একটি কাহিনী

কিউবার হাভানা সহরে মাত্র চার বছরের একটি বালক হঠাৎ একদিন তার মাকে জানালে. "মা. আমি কিন্তু যে বাড়ীটায় আগে থাকতাম সেটা এটার থেকে একটু অন্য ধরণের। আমরা তখন 'রু কম্পানারিও' অঞ্চলে থাকতাম। আমার বেশ মনে আছে আমাদের বাড়ীর নম্বর ছিল ৬৯।" ছেলেটি তার বাবা-মায়ের সঙ্গে সে সময়ে 'রু সান জোস' অঞ্চলের ৪৪ নম্বরের বাড়ীতে থাকতো। তার বাবা একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে ব্যবসা করছিলেন। ছেলেটি এই বাড়ীতেই জন্মায় এবং বরাবর এখানেই আছে।

বাবা-মা প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি কথাগুলোয়। কিন্তু ছেলেটি বারবার একই কথা এবং পূর্বজীবনের উল্লেখ করতে থাকায় একদিন তাঁরা ছেলের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে কাহিনী জানতে পারলেন তা অনেকটা এই ধরণের।

"৬৯ নম্বর 'রু কাম্পানারিও'তে আমি যখন থাকতাম তখন আমার বাবার নাম ছিল পিয়েরী সেকো এবং মায়ের নাম ছিল আম্পারোঁ।

আমার মার্সিডিজ ও জীন নামে দুটি ছোট ভাই ছিল, আমি তাদের সঙ্গে খেলা করতাম, মনে আছে। শেষবার আমি যখন ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই আমার মা সে সময়ে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। আমার এই অন্য মা দেখতে খুবই ফরসা ছিল, তার মাথায় ঘন কালো চুল ছিল। মা অনেক টুপি তৈরী করতো। বয়স আমার সে সময়ে বছর তেরো। আমি প্রায়ই আমেরিকানদের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনতাম। কারণ ওদের দোকানে ওষুধের দাম অন্যদের থেকে সস্তা ছিল। বাইরে থেকে এসে আমি আমার সাইকেলটা বরাবর বাড়ীর কোণার ঘরে রাখতাম। আমাকে এখনকার মত এডুয়ার ডো বলে কেউ ডাকতো না, সবাই আমাকে পাঞ্চো নামে ডাকতো।"

এধরণের কথাবার্তার পর তার বাবা-মা সঙ্গতভাবেই কিছুটা কৌতূহলী হন। তাঁরা ব্যাপারটাকে যাচাই করে দেখবেন বলে স্থির করলেন। একদিন খুঁজে পেতে তারা 'রু কাম্পানারিও'-তে ৬৯ নম্বর বাড়ীটা বার করলেন। একদম অপরিচিত বাড়ী, শুধু ছেলেটি কেন তার বাবা-মাও আগে কোনদিন সে বাড়ীতে পা দেননি। কিন্তু বাড়ীর কাছে আসতেই ছেলেটি চীৎকার করে ওঠে, "হ্যাঁ, এই বাড়ীতেই আমরা থাকতাম।"

"ঠিক আছে", বাবা উত্তর দেন, "তাহলে তুমিই আগে ভেতরে যাও —চিনতে যখন পেরেছো।"

ছেলেটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে খুব পরিচিত এবং চেনা জানা লোকের মত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায় এবং একটি ঘরের মধ্যে ঢোকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে নিজের পরিচিত "বাবা-মাকে" দেখতে না পেয়ে অন্য অচেনা লোকদের দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে।

ছেলেটির বাবা তখন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন কতকগুলি আশ্চর্যজনক খবর :

(১) ১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছুকাল পরেও ৬৯

নম্বর 'রু কাম্পানারিওর' বাড়ীতে এ্যানটানিও সাকো বলে জনৈক ব্যক্তি থাকতেন। পরে তিনি হাভানা ছেড়ে চলে যান।

(২) মিঃ সাকোর স্ত্রীর নাম আম্পারো এবং তাঁদের তিনটি ছেলের নাম ছিল মার্সিডিস, জীন এবং পাঞ্চো।

(৩) ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁদের ছোট ছেলে পাঞ্চো মারা যায় এবং তারপরেই মিঃ সাকো এই বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

(৪) উল্লিখিত বাড়ীর কাছে আজো একটি আমেরিকান ওষুধের দোকান আছে - যে দোকান থেকে এডুয়ার ডো ওষুধ কিনতো বলে দাবী করেছে।

এখন সঙ্গত কারণেই এই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে, তাহলে কি পাঞ্চোই পরবর্তীকালে এডুয়ার ডো রূপে পুনর্জন্ম নিয়েছে? প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়, কারণ এ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জন্মান্তরের অনেক জটিল সূত্র জড়িত রয়েছে। মুনেশের ক্ষেত্রেও এ প্রশ্ন উঠে ছিল। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিচার করলে আমরা অবশ্য নীচের সিদ্ধান্তগুলি জানতে পারি।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অভ্রান্তভাবে আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকার করে বা মেনে নেয়। এই বিশ্বাসটি মানব জীবনের জন্মসূত্রের মতই প্রাচীন এবং সর্বজনসম্মত স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে অনাদি অতীত থেকে। বিজ্ঞান গ্রাহ্য প্রমাণ হাতে নাতে দিতে না পারা গেলেও পুনর্জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে মেনে নেওয়া হয়েছে যে ঃ—

(১) দেহের বিনাশের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের ধ্বংস হয় না।

(২) এই ব্যক্তিত্বকেই অন্য নামে কিংবা এরই কোন অংশকে হয়তো "আত্মা" বলা হয়ে থাকে। আত্মা মৃত্যুহীন এবং পরমাত্মার অংশ বিশেষ।

(৩) আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের নীতিবোধ ও জীবন যাপনের ধারা থেকে আত্মার পরবর্তী জন্মের স্বরূপ নির্ণীত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আমাদের কর্মফলই ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী।

(৪) সৎ আচরণ, সৎ চিন্তা ও জ্ঞান আহরণ এবং অধ্যাত্ম বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আত্মা জীবন ধারণের ক্লেশ থেকে মুক্ত হয় ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়।

তুলনামূলক বিচারের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় খুব স্পষ্টভাবে না হলেও ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যে জন্মান্তরের উল্লেখ ও স্বীকৃতি রয়েছে। মনু সংহিতার কাল থেকে সুরু করে আমাদের পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণের যুগ অতিক্রান্ত করে এই বিংশ শতাব্দীতেও ভারতবাসী জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

খৃষ্টীয় ধর্ম ও জন্মান্তরবাদ

ভারতবর্ষে পুনর্জন্মের প্রতি একটা সহজাত মান্যতা আছে বলে অনেক সময়ে দেখা যায় অলীক ও অসত্য কাহিনী ও প্রবাদকে আমরা মেনে নিয়েছি। পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম বিশ্বাসে পুনর্জন্মের কোন স্থান নেই বিশেষ একটা—অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণার উপযোগী পুনর্জন্মের ঘটনাকেও তারা আমল দেয় না। আধুনিক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা জন্মান্তরবাদে মূলত বিশ্বাসী নয়—অতীতে কয়েকটি সম্প্রদায় যদিও একদা একে মান্যতা দিয়ে এসেছে। সেন্ট জন লিখিত সুসমাচারে (একাদশ অধ্যায়) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে, যেটি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তা না হলে সঠিক ব্যাখ্যা করা খুবই মুশকিল।

সমসাময়িক কিছু কিছু বিজ্ঞ প্রবক্তা এমন কথাও বলেছেন যে যীশু খৃষ্টই বিগত জীবনে ইলিসিয়াস ছিলেন। জনৈক বিশেষজ্ঞ বাইবেল নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর জানালেন, "আমার স্থির বিশ্বাস যে তিনি (যীশুখৃষ্ট) বিগত জীবনে ইলিসিয়াস ছিলেন এবং তাঁর দীক্ষাগুরু ব্যক্তি ছিলেন ইলিজা।" ইলিসিয়াস যে ভবিষ্যৎ জীবনে যীশুখৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করবেন সে কথা ওল্ড টেষ্টামেণ্টে কয়েকবার

বছর আগে উল্লেখ করা হয়: কারণ তিনি ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য পৃথিবীতে আসবেন। এই ভবিষ্যৎ-বাণী খৃষ্ট জন্মের আটশ' বছর আগে ওল্ড টেষ্টামেণ্টে (Isiah : 7.14) এভাবে উল্লিখিত আছে, "সেই মত প্রভু তোমাদের এক সংকেতের মাধ্যমে সচেতন করবেন। দেখো, একজন কুমারী মাতার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে তার নাম হবে, ইমানুয়েল।" সেণ্ট ম্যাথ্যু যীশুখৃষ্টের জন্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে (ম্যাথ্যু: ১।১২।২৩) জানিয়াছেন, "সেই সন্ত প্রভুর প্রসঙ্গে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে কুমারী মায়ের গর্ভজাত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং সকলে তাকে ইমানুয়েল বলে অভিহিত করবে, তা সবই যথাযথ সত্য প্রমাণিত হতে ধরে নেওয়া হল ঈশ্বর আমাদের মধ্যে জন্ম নিলেন।"

যীশু খৃষ্টের জন্মান্তরের এইবিতর্ক মূলক প্রসঙ্গ বাদ দিলেও এবং খৃষ্টধর্ম পুনর্জন্মকে অস্বীকার করলেও জন্মান্তরের বহু ঘটনার খবর আমরা জানতে পারি।

খৃষ্টীয় পরিবারে একটি বিচিত্র কাহিনী

জেনিফার ও জিলিয়ান পোলোক দুই যমজ বোন—গভীর নীল তাদের চোখের রঙ, মাথায় নিবিড় ঘন একমাথা চুল। বড় সুন্দর দেখতে। বাবা মায়ের ধারণা যে তাঁদের মৃত কন্যারাই আবার পুনর্জন্ম নিয়েছে। এগারো বছরের দিদি জোয়ানার হাত ধরে ছ'বছরের জ্যাকুলিন রাস্তা পেরিয়ে চার্চের দিকে যাচ্ছিল। আচমকা গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে দুজনেই মারা যায়। নর্থাম্বারল্যাণ্ডের সহরতলী হেক্সামে তখন তারা থাকতো।

মিঃ পোলক রোমান ক্যাথলিক। নিজের ধর্মমত অনুযায়ী জন্মান্তরবাদে তাঁর বিশ্বাস থাকা উচিত নয়। তিনি জানালেন, "কিন্তু অবিশ্বাস করে থাকা আরো অসম্ভব—দিনের পর দিন আমি ও আমার স্ত্রী যা দেখছি ও শুনছি তাতে জন্মান্তরবাদকে না মেনে উপায় নেই।

মেয়েদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর শ্রীমতী পোলোক যখন আবার গর্ভবতী হলেন মিঃ পোলকের এক অদ্ভুত ধারণা জন্মায় যে তাঁর আগের মেয়েরাই পুনরায় জন্ম নিতে আসছে। তাঁদের হারানো মেয়েরাই তাঁদের কাছে ফিরে আসবে। তিনি ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করতে চাইলেন না এবং তাঁর স্ত্রী তো বিষয়টাকে আমলই দিতে চান নি। প্রসবের সময় আসন্ন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা এতই বদ্ধমূল হতে থাকে যে তিনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। ডাক্তার স্ত্রীকে পরীক্ষা করার পর জানালেন, জমজ সন্তান প্রসবের কোন সম্ভাবনা নেই কারণ মাত্র একটি ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন ও এক জোড়াহাত পায়ের গঠন অনুভব করতে পারছেন তিনি।

কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহ পরে শ্রীমতী পোলক জমজ কন্যার মা হলেন।

প্রথমে যে ব্যাপারে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেটি একটি আঘাতের চিহ্ন। মৃত কনিষ্ঠা কন্যা জ্যাকুলিন তিন বছর বয়সের সময় পড়ে গিয়েছিল একবার—ডান চোখের পাশে কপালের কাছ থেকে নাক বরাবর প্রায় সোয়া ইঞ্চির মত একটি ক্ষতের দাগ থেকে যায় সেই থেকে। জেনিফারের কপালে ঠিক সেই ধরণের সাদা দাগ বর্তমান ছিল। জ্যাকুলিনের দাগটি ক্রমশঃ মিলিয়ে এসেছিল, শীতের সময় ছাড়া সেটা খুব একটা হয়ে উঠতো না—জেনিফারেরও ঠিক স্পষ্ট তাই।

তাছাড়া জেনিফারের বাঁ-পাছায় একটা সিকির মত আকারের লাল গোল জরুল চিহ্ন রয়েছে। মৃত জ্যাকুলিনের অবিকল সেই জায়গায় সেই আকারের জরুল চিহ্ন ছিল। ক্রমশ জেনিফার যত বড় হয়ে উঠতে থাকে ততই সে জ্যাকুলিনের ভাব-ভঙ্গি অনুকরণ করতে থাকে। লেখায় তার একটা সহজাত প্রবণতা দেখা গেল। কলম বা পেন্সিল ধরতো আগের মতো অদ্ভুত ভাবে; ডান হাতের মাঝের অঙুলে কলম ধরে মুঠো করে আর কব্জি ঘষে ঘষে লেখা।

জিলিয়ানের সঙ্গে আগের বোন জোয়ানার চেহারায় কিছুটা মিল থাকলেও তাদের দুজনের সাদৃশ্য জেনিভারের মত এত প্রকট ছিল না। তবুও কতকগুলো জিনিষ থেকে বাবা মা সহজেই জিলিয়ান ও জোয়ানার মিল খুঁজে পেতেন - যেমন বর্তমানে দুবোন সমবয়সী হলেও জিলিয়ানের আচরণ ও স্বভাবে ঠিক আগের সমভাব বর্তমান ছিল, সর্বদাই বোনকে হাত ধরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো; আর চেহারাও তেমনি একহারা পাতলা ছিপছিপে— ইচ্ছে, পছন্দ পর্যন্ত একেবারে এক।

মাঝে মধ্যে জিলিয়ানকে দেখতে পাওয়া যেত জেনিফারের গাল দুটি দুহাত দিয়ে ধরে আদর করতে করতে আগের অ্যাক্সিডেন্টের আঘাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে যাচ্ছে। তার বর্ণনায় কোন ভুল ছিল না। জোয়ান ও জ্যাকুলিন মারা যাবার পর তাদের কিছু কিছু খেলনা প্যাকেটে করে আলাদা সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। একদিন হঠাৎ মিঃ পোলকের হাতে সেই খেলনার একটি প্যাকেট আসে। জিলিয়ান তার থেকে খেলাঘরের ছোট কাপড় কাচার মেসিনটি তুলে নিয়ে খুশিতে বলে ওঠে, "বাবা, এই দেখো আমার পুতুলের কাপড় কাচার মেসিন এটা।" জোয়ানাকেই একদা সেটি কিনে দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক তেমনই জ্যাকুলিনের একটি প্রিয় পুতুল দেখে জেনিফার কাঁদতে শুরু করে দেয়, "ওটা আমার সেই মেরী পুতুলটা।" জ্যাকুলিনই পুতুলটার নাম দিয়েছিল "মেরী"। আর জেনিফার আগে কোন দিনই পুতুলটি দেখেনি কিংবা বাড়ীতেও সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি এর আগে।

আর একবার মিঃ পোলক বাড়ীতে কিছু রঙের কাজকর্ম করার সময় নিজের কাপড় জামা বাঁচানোর জন্য স্ত্রীর একটি পুরোনো বিবর্ণ কোট গায়ে চাপিয়ে ছিলেন। মেয়েরা যেদিন মারা যায় সেদিন সকালে ঐ কোটটি ব্যবহার করেছিলেন বলে অপয়া হিসেবে শ্রীমতী পোলক আর ওটি কখনো পরেন নি।

জেনিফার বাবাকে দেখে সেদিন হঠাৎ বলে ওঠে, "ওমা, তুমি মার কোট পরেছো কেন, ওটা পরে মা তো ইস্কুলে যেত।"

মিঃ পোলক খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েন কথাটি শুনে। কারণ জ্যাকুলিনকে স্কুল থেকে নিয়ে বা দিয়ে আসার সময়ে প্রধানতঃ তাদের মা এই কোট পরতো।

পূর্বজন্মের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পরবর্তী জীবনে দেহধারণের ঘটনা কিন্তু খুব দুর্লভ নয়। আর এধরণের ক্ষত দাগগুলি বা বিকৃতিগুলি সত্যি সত্যি বিগত জীবনের কার্যকারণ থেকে চলে আসছে কিনা তার সঠিক প্রমাণ খুবই জটিল। এসম্পর্কে অন্যত্র আলোচনার সুযোগ রইল আমাদের।

ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অদেহী ব্যক্তিক প্রতিনিধিত্ব (Incorporal Personal Agency) হল মৃত্যুর পর মানুষের তথাকথিত দেহহীন রূপ। এর সঙ্গে দুটো জটিল প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে—আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্মান্তর। আত্মা ও জন্মান্তর ভারতবর্ষে অত্যন্ত পুরোনো বিশ্বাস কিন্তু পরামনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে আজ এর বাস্তব সত্যতা যাচাই করতে লেগেছেন। এ প্রশ্নকে পাশ্চাত্য দেখেছে মাধ্যমের (Mediumship) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর ভারতবর্ষে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন মস্তকাতীত স্মৃতির (Extra Cerebral Memory বা সংক্ষেপে ECM) দৃষ্টিকোণ থেকে। হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদ বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে বলে আমরা কোন ধরণের সমালোচনা না করেই এত সহজে অপ্রাকৃত ব্যাপারটা মেনে নিই এবং এর যে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকা দরকার বা খোঁজা দরকার সেদিক দিয়ে এতকাল ভেবে দেখবার প্রয়োজনই বোধ করিনি।

ইসলাম ধর্ম ও জন্মান্তরবাদ

হিন্দু বৌদ্ধ কিংবা জৈন ধর্মের মত নীতিগতভাবে ইসলাম ধর্ম কিন্তু জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে নেয়নি। পুনর্জন্ম সম্পর্কে কোন নির্দেশ ইসলাম ধর্মে না থাকলেও কিছু কিছু মনীষী কোরাণের শ্লোক উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে সেখানে জন্মান্তরের ইঙ্গিত আছে। এ ধরণের একটি শ্লোকে রয়েছে, তিনি বললেন, "যাও পৃথিবী পরিক্রমা করে দেখে এসো এই চরাচরে জীবসমূহকে তিনি কিভাবে আনয়ন করেছেন। পরবর্তী দ্বিতীয় জন্মের পরেও আল্লা তাদের পুনরায় জন্মের ব্যবস্থা করতে পারেন; কারণ

আল্লাই সর্বশক্তিমান।" তুরস্কের একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই পুনর্জন্ম ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। ঘটনাটির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে সংক্ষেপে।

তুরস্কের একটি ঘটনা

"আমি এখানে আর থাকতে চাই না. আমার আর ভাল লাগছে না। আমি আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের কাছে যেতে চাই।"— না, আত্মীয় স্বজনের অশ্রদ্ধা, অভক্তিতে বিরক্ত হয়ে কোন বৃদ্ধের আক্ষেপ নয়. এ কথাগুলো, নিতান্তই একটি বাচ্চা ছেলের ঘোষণা মাত্র।

তুরস্কের আডনা জেলায় এক কসাই তথা মুদির দোকানদারের ছেলে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করে ১৯৫৬ সালে। মাত্র আঠারো মাস বয়স যখন তার তখন থেকেই পূর্ব জীবনের কথা বলতে সুরু করে সে। বিছানায় বাবার পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে শিশু ইসমাইল একদিন জানায়, "এখানে থাকতে আমার আর ভাল লাগে না। আমি নিজের ছেলে মেয়েদের কাছে ফিরে যেতে চাই।"

ইসমাইলের কথামত তার আসল নাম হল আলবেইট সুজুলমাস। আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু হয়। ইসমাইলের মাথায় জন্ম থেকেই আঘাতের ক্ষত চিহ্নের মত একটা দাগ ছিল। তার মার মতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সেই দাগটা দেখতে পাওয়া যেত, তারপরে মিলিয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সুজুলমাস মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যায়।

সুজুলমাস ছিল বেশ সমৃদ্ধিশালী ফুলের ব্যবসায়ী, থাকত মিডিক জেলার বাহাহী অঞ্চলে। তার প্রথমা স্ত্রী মাতিসের কোন ছেলে মেয়ে না হওয়াতে সুজুলমাস তাকে ডিভোর্স করে দ্বিতীয় বিবাহ করে। দ্বিতীয় স্ত্রী সাহীদার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হয়।

আলবেইট অবশ্য তখনো মাতিসের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। সে দ্বিতীয়া স্ত্রী সাহীদা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে বাড়ীতে থাকতো মাতিস তার পাশের বাড়ীতে থাকতো। সে বাড়ীটিও আলবেইটের।

সুজুলমাস তার বাগানে কাজ করবার জন্যে আশপাশের সহরের কিছু নতুন জনমজুরদের লাগিয়েছিল। তারাই একদিন সুজুলমাসকে বাগানের ধারে আস্তাবলে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলে। কেন তারা একাজ করলো সেটা অবশ্য জানা যায় নি। তার আর্তনাদ শুনে সাহীদা ও দুটি ছেলে ঘটনা স্থলে দৌড়ে যায় কিন্তু আততায়ীরা তাদেরও খুন করে পালিয়ে যায়। দিন সাতেক বাদে অবশ্য সকলে ধরা পড়ে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়।

ইসমাইল তার বাবা-মাকে প্রায়ই অনুরোধ করতো সুজুলমাসদের বাড়ীতেনিয়ে যেতে। ব্যাপারটা নিয়ে পাছে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়, এইসব নানা কথা ভেবে ও কিছুটা ধর্মভয়ে তার বাবা-মা তাকে প্রথম দিকে নানা ভাবে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। পরে এক বন্ধুর আগ্রহ ও উৎসাহে শেষ পর্যন্ত বাবা-মা রাজী হল। তিন বছরের ইসমাইল সকলকে পথ দেখিয়ে প্রায় মাইল খানেক দূরে আলবেইটের বাড়ীতে নিয়ে যায়। বাড়ীতে পৌঁছে সে পরিবারের সকলকে চিনতে পারে এবং মাতিসকে আলিঙ্গন করে। সকলকে অবাক করে দিয়ে ইসমাইল এক এক করে আলবেইটের সব জিনিষপত্রগুলো সনাক্ত করতে পারে। কয়েকদিন বাদে সুজুলমাসের বড় মেয়ে ইসমাইলের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলে। ফিরে যাবার সময় সে সকলকে জানিয়ে যায়, তার বাবাই যে ইসমাইল হয়ে আবার জন্ম নিয়েছে এ বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ নেই।

এর পর থেকে ইসমাইল তার আগের জীবনের আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তাতেই বেশী মেতে থাকতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে তার

বাবা-মাকে সে জন্য বেশ মুস্কিলে পড়তে হত। একদিন তার বাবা মেহমেট আলটিন ক্লিশ বাড়ীর জন্যে কয়েকটা তরমুজ কিনে আনেন। ইসমাইল জানালো ওর মধ্যে সব থেকে বড় তরমুজটা তার মেয়ে গুলসারিনকে দিয়ে আসতে হবে। তার বাবা আপত্তি করতে সে ভীষণ কান্নাকাটি সুরু করে দেয়। আসলে মেহমেটের অবস্থা তেমন কিছু সুবিধের নয়, ছেলের পূর্ব জীবনের আত্মীয়-স্বজনকে ভেট পাঠানো সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। ইসমাইলের হাবভাব ক্রমশ বেশ পাল্টে যায়। সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মত আচরণ করতে থাকে। তার বাবা-মাও তাকে অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে একটু বেশি সমীহ করতে লাগলেন। তাছাড়া জানা গেল ইসমাইল বেশ স্বচ্ছন্দে "রাকী" (একধরণের কড়া মদ) খেতে পারে যেটা ওর বয়সের পক্ষে খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আলবেইটের পরিচিতরা বলে যে, আলবেইট নাকি রাকীর বিশেষ ভক্ত ছিল।

ইসমাইলের পাড়ায় একবার এক আইসক্রীমওলা আসে। ইসমাইল সোজাসুজি তাকে প্রশ্ন করে যে সে চিনতে পারছে কিনা তাকে। আইসক্রীমওলা তার অজ্ঞতা প্রকাশ করাতে সে উত্তর দিলে, "তুমি আমাকে ভুলে গেছ দেখছি। আমার নাম আলবেইট। আগে তুমি আইসক্রীম বিক্রী করতে না, তরমুজ আর শাকসব্জির ব্যবসা করতে।" লোকটি থতমত খেয়ে স্বীকার করে, সে আগে তরকারী বিক্রী করতো এবং ছেলেটির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলে নিঃসন্দেহ হয় যে আলবেইটই পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেছে। ইসমাইলের বাবা আইসক্রীমের পয়সা দিতে গেলে ইসমাইল তাকে বারণ করে, "ওকে কোন পয়সা দিতে হবে না, ও আমার বাগানের তরমুজ নিত, আমি তার দরুণ পয়সা পাবো ওর কাছে।" আইসক্রীমওলা ধার স্বীকার করে নেয়।

ইসমাইলের ঘটনা কি কোন অলীক গালগল্প? এর সঠিক উত্তর কে দেবে? কিন্তু কতকগুলো কথা আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি। প্রথমত দেখতে হবে যে ঘটনাটা একটি মুসলমান পরিবারে ঘটেছে,

সাধারণত পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ত ইসমালের পরিবারের কেউ এই ঘটনাটা প্রচার করতে চায়নি বরঞ্চ তারা প্রথম দিকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টাই করেছিল। এই কাহিনী প্রচার হওয়াতে তাদের কোন আর্থিক লাভ হয়নি; মেহমেট আলটিন ক্লিস এইসব তথ্য যাচাই করতে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই বিরক্ত বোধ করতেন কারণ ওসব ঝামেলায় তার সময় ও অর্থদণ্ড দুই অযথা হচ্ছে বলে তিনি মনে করতেন। তাছাড়া তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খুবই শঙ্কার মধ্যে থেকেছেন পাছে তাঁদের ছেলে কোনদিন তার আগের জীবনের আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যায় ভেবে। মেহমেট অনেক আগে কিছুকাল আলবেইটের খামারে কাজ করেছিলেন, সেই সূত্রে আলবেইটের কিছু কিছু খবর তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো যে, তিনি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই মিথ্যে কাহিনী রটনা করেছেন? কিন্তু এ ধারণা আমাদের টিকবে না। কারণ ইসমাইল এমন কতকগুলো গোপনীয় কথা বলেছিল যা আলবেইটের অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কারোর জানা সম্ভব ছিল না। কোনো আরোপিত ব্যাপার হিসাবে এটাকে মেনে নিতেও আমাদের খুবই অসুবিধে হয়। কারণ বিগত জীবনের লোকজনদের দেখে ইসমাইলের আকুলতা স্নেহমধুর আচরণ এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে তাকে অভিনয় ভাবা চলে না।

নেকাটি আনলাকাস্কিরনের বিচিত্র ঘটনা

অনেকেই প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে, সেটাকে আমরা প্রতিভা বলে মেনে নিয়েছি। তার জন্যে আমাদের কোন ভাবনা ও গবেষণা করার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু এই স্মৃতি-শক্তি যুগ যুগান্তরের কথাবার্তা স্মরণ করতে সুরু করলে আমরা সচকিত হয়ে উঠি, বিস্মিত হই। সাধারণ লোকেরা সে সব খবর শুনে চমৎকৃত হয় আর বিজ্ঞানীরা ভাবেন কেমন করে এটা সম্ভব। বাঁধা ধরা কোনো সংজ্ঞা নেই বলে সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি খাড়া

করে ব্যাপারটার তাঁরা সমাধান করতে পারেন না। এ ধরণের অতীত স্মৃতির যারা অধিকারী তাদের কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে তবেই হয়তো কোনদিন এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

পুনর্জন্মের যে অসংখ্য ঘটনার খবর পাওয়া গেছে নেকাটির ঘটনাটি তার মধ্যে সাম্প্রতিক। নেকাটি আনলাকাস্কিরনের জন্মের পরেই নামকরণ হয় 'মালিক' বলে। কিন্তু ঠিক দু'দিন পরে তার মা স্বপ্ন দেখে যেন তার নবজাত শিশু 'মালিকের' বদলে 'নেসিপ' নামটা রাখতে বলছে। কিন্তু অতি নিকট আত্মীয়দের একটি ছেলের নাম 'নেসিপ' ছিল এবং কিংবদন্তী রয়েছে যে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে দুই ছেলের নাম এক হলে পরিবারে অনেক বিপদ-আপদ দেখা দেয়। তাই শেষ পর্যন্ত মালিকের নাম পাল্টে 'নেকাটি' রাখা হয়।

নেকাটি মুখে কথা ফুটতেই সে তার আগের জীবনের কথাবার্তা বলতে স্থরু করে। সে জানায় যে তার নাম ছিল 'নেসিপ বুডাক, তারা 'মার্সিন' শহরে থাকতো এবং তাকে খুন করা হয়েছিল। একটু বড় হতে সে আরো খবর জানায়। সে নিজের বিয়ের ঘটনা-ও ছেলেমেয়েদের গল্প করে। ছেলেদের মধ্যে 'নেজাট' তার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র ছিল, সে তাকে কাঁধে নিয়ে নাকি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াত। তার সুন্দরী স্ত্রী জেহরার সম্বন্ধে কথা বলার সময় তার মুখে এক অনির্বচনীয় ভালবাসার ভাব ফুটে উঠতো।

কথা প্রসঙ্গে সে তার খুনীর নাম জানায় এবং ঠিক কিভাবে তাকে খুন করা হয় তার বিশদ বিবরণ দেয়। সে তার খুনীর নাম বলে 'আহমেদ রেস্কিল'। রেস্কিল নাকি কিছুটা চা দাবী করেছিল তার কাছে সে তা না দিতে লোকটা ভীষণ রেগে যায়। খানিকটা কথা কাটাকাটি হবার পর আহমেদ রেস্কিল তার বাঁকানো ছুরিটা দিয়ে নেসিপের মাথার পেছনের দিকে, মুখে, বুকে, চোখের ওপরে এবং পেটে আঘাত করে।

এই কথাগুলোর সত্যতা প্রমাণিত করার জন্যেই যেন তার শরীরের এইসব জায়গায় জন্ম থেকেই কিছু আঘাতের চিহ্ন ছিল। সেগুলো দেখিয়ে সে জানায় যে, ওগুলো গতজন্মের আঘাতেরই দাগ। দাগগুলো দেখেও মনে হয় ঠিক যেন কোন ক্ষতের ঘা শুকিয়ে সেরে গিয়ে দাগ হয়েছে সেখানে।

নেকাটিকে একদিন নেসিপের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতের স্ত্রী জেহরাকে সে নিজের স্ত্রী বলে সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত করে। সে একজন বাদে অন্য ছেলেমেয়েদের চিনতে পারে ও তাদের নাম বলে। খবর নিয়ে জানা গেল, যে সন্তানটির নাম সে বলতে পারেনি সে তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জন্মায়। নেসিপের মৃত্যুকালে জেহরা গর্ভবতী ছিল।

কোন এক সময়ে ঝগড়াঝাটির মধ্যে নেসিপ রাগে জেহরার পায়ে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছিল, সেই ঘটনাটি নেকাটি উল্লেখ করতে জেহরা বিশেষভাবে বিস্মিত হয়। জেহরা ঘটনাটি স্বীকার করে এবং নেকাটির নির্দেশমত দেখা যায় তার ডান পায়ের উরুতে দাগ রয়েছে। নেকাটি আরো জানায় যে মৃত নেসিপকে কবর দেবার দিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। জেহরা ও অন্য আত্মীয়েরা সেটিকে সত্য বলে জানায়।

নেসিক বুডাক পরবর্তী জন্মে নেকাটি রূপে জীবন ধারণ করেছিল কিনা এটা মেনে নেবার আগে আমরা কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নেড়েচেড়ে দেখতে পারি বোধ হয়।

প্রথমতঃ নেকাটির জন্মস্থান আডনা সহর থেকে নেসিপের বাসস্থান মার্সিন সহরের দূরত্ব প্রায় ৭৪ কিলোমিটারের মত। সুতরাং প্রতিবেশীদের জীবন যাত্রার খবর জেনে নেবার যে সম্ভাবনা থাকে, এ ক্ষেত্রে তা ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, নেকাটির পূর্বজীবনের ঘটনা ইত্যাদি বলার আগে দুই পরিবারের মধ্যে কোনো আলাপ-পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল না। দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের খবর যেমন জানা সম্ভব

নেকাটির পক্ষে সে ভাবেও খবর জোগাড় করার উপায় ছিল না। পূর্ব জীবনের এই বিচিত্র দাবী উত্থাপন করার আগে নেকাটি কোনদিন মার্সিন শহরে যায় নি।

তৃতীয়তঃ, এই অদ্ভুত কাহিনী প্রচার হয়ে পড়াতে প্রায়ই দুই পরিবারে কৌতূহলী লোকেরা খোঁজ খবর নিতে যেত এবং তাতে পরিবার দুটি নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে এই ধরণে বিরক্ত করার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে যথেষ্ট তিক্ততার সম্পর্কে গিয়ে পৌঁছায়।

স্মৃতিশক্তিকে যাঁরা একান্ত দেহগত একটা জৈবিক উপাদান মনে করেন তাঁরা নেসিপের পরবর্তীকালে নেকাটি রূপে জন্মানোর এই আপাত দৃষ্টান্ত মানতে পারেন না। দেহের বিনাশের পর আত্মা বা স্মৃতিশক্তি একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে কিনা এ প্রশ্নের সমাধান তাদের আগে প্রয়োজন। তাঁরা তাই ব্যাপার-টাকে আধ্যাত্মিক বুজরুকি বলে ধরে নিয়েছেন। অনেকে এই ধরণের পূর্ব জীবনের স্মৃতিস্মরণকে টেলীপ্যাথির দ্বারা সম্ভব বলে ব্যাখ্যা করেন। কারণ টেলীপ্যাথির সাহায্যে একজনের পক্ষে অন্যের মনের খবর জানা সম্ভব।

নেকাটির ঘটনাকে তাহলে কি টেলীপ্যাথি বলতে পারি আমরা? বোধ হয় পারি না। কারণ নেকাটির যে টেলীপ্যাথি বা অন্যের চিন্তা পঠনের ক্ষমতা আছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। নেসিপ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গের কাহিনী সে কখনো জানায় নি। তাছাড়া টেলীপ্যাথির ক্ষমতা থেকে নেসিপের জীবন কাহিনী হয়তো কেউ জানতে পারে কিন্তু তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারা কিংবা নেসিপের ব্যবহৃত জিনিষ পত্র সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অতীত আত্মীয়-স্বজনকে দেখে মানুষের মনের যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভাবনাগুলি জেগে ওঠে তার জবাব টেলীপ্যাথি প্রসঙ্গে খাটবে না। কারণ টেলিপ্যাথির মাধ্যমে কেবল ঘটনাটাই জানা যেতে পারে তার বেশী কিছু নয়।

রসুলপুরের জসবীরের কাহিনী

রসুলপুরের তরুণ বালক জসবীর একদিন রাত্রে মারা গেল। শোকাহত বাবা-মা সকালে তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করতে লাগলেন। কিন্তু সকাল বেলা জসবীরের দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ বাদেই তার জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু জ্ঞান হবার পর দেখা গেল সে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সে জানাল যে, সে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং এই মুসলমানের বাড়ীতে তার থাকা খাওয়া সম্ভব নয়। শেষে তার জন্যে এক ব্রাহ্মণ মহিলা রান্না করে দিতে সে সেই খাবার গ্রহণ করে। আঠার মাস এই একই ব্যবস্থা চালু ছিল। এ সময়ে বেহেদী গ্রামের স্কুলশিক্ষক পণ্ডিত রবি দত্ত একবার রসুলপুরে আসেন। জসবীর তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারে এবং তার কাছে শঙ্কর লাল ত্যাগী ও বেহেদী গ্রামের অন্য লোক-জনদের খবরাখবর নিতে থাকে। সকলে এতে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তাকে সে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলে গ্রামের অনেককেই সে সনাক্ত করতে পারে।

সেখানে খবর নিয়ে জানা গেল জসবীর যে রাতে মারা যায় তার অল্প কিছুক্ষণ বাদে শঙ্কর লাল ত্যাগীর ২৫ বছর বয়স্ক ছেলেও মারা যায়। ছেলেটি বিবাহিত এবং তার তিনটি ছেলে মেয়ে বর্তমান। জসবীর আজও রসুলপুরের বাসিন্দা—কিন্তু নিজের বর্তমান বাবা-মার সঙ্গে সে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারে নি। সে তার নিজের বিগত জীবনের চিন্তা ভাবনাতেই বেশী সময় কাটায়, বেশী আনন্দ পায়।

এই বিচিত্র ঘটনাগুলির সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক সূত্র সন্ধানে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা এখন বিশেষভাবে সচেষ্ট। জন্মান্তরের আরো বহু ঘটনা তারা নতুন করে বিচার করে দেখছেন।

মৃত্যুর পরেও স্মৃতি বা আত্মা বেঁচে থাকে, এমন কথা প্রমাণ করার মত কোন যুক্তি আছে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁরা বলে থাকেন, মানব দেহ কতকগুলি অণুপরমাণুর সমষ্টি,

সেগুলি এক জৈবিক প্রাণসত্তার দ্বারা পরিচালিত এবং বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনের সম্মিলিত ফল।

ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী ও স্নায়ুতত্ত্ববিদরা বহুবারই মন ও দেহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও কার্য প্রকরণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এসব থেকে ধারণা হয় যে, জীবিত ব্যক্তির স্মৃতি কতকগুলি দেহগত সত্তার উপরে নির্ভরশীল। তবুও কিছু বিজ্ঞানী এর উল্টো কিছু একটা চিন্তা করে জন্মান্তরের ঘটনাগুলি বিচার করে চলেছেন—তাঁরা পরামনোবিজ্ঞানী। কারণ তাঁদের ধারণা স্মৃতি যদি কেবলই দেহজাত অনুভূতি হত তাহলে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ পর্যন্ত বহু ছেলেদের পরিচয় পাওয়া গেছে যারা আগের জীবনে কথা পরিষ্কার ভাবতে পারে এবং পরীক্ষা করে তার সত্যতা যাচাই হয়ে গেছে। সে সব ঘটনা প্রথাগত ভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখাও হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে জন্মান্তরবাদের উত্তর খুঁজে বার করতে হবে।

রাজকোটের মেয়ে রাজুলের কাহিনী

ছোট্ট মেয়ে রাজুলের জন্ম ১৯৬০ সালে। তার বাবা শ্রীপ্রভীন চন্দ্র শাহা রাজকোট জেলার কেশলোড সহরে ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। রাজুলের যখন মাত্র তিন বছর বয়স তখনই সে অতীত জীবনের কথা বলতে সুরু করে। সে জানায় তাদের বাড়ী জুনাগড়ে (রাজকোট জেলাতেই) এবং সে বাড়ীতে তাকে সকলে "গীতা" বলে ডাকতো।

প্রথমে তার বাবা-মা এসব কথা বিশেষ কানে নেন নি। ছেলে-মানুষের আজগুবি বা খেয়ালী কথাবার্তা ভেবেছিলেন এবং যখনই সে ওধরণের কথা বলতে সুরু করেছে তাকে বারণ করেছেন। তার ঠাকুর্দা শ্রীভজুভাই শাহ কিন্তু ব্যাপারটায় কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং মেয়েটির এই দাবী যাচাই করে দেখতে থাকেন। তাঁর জামাই সুরেন্দ্র নগরে থাকতেন, তাকে তিনি জুনাগড়ে গিয়ে স্থানীয়

মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে খোঁজ করে দেখতে বললেন যে, সেখানে গীতা নামে সম্প্রতি কেউ মারা গেছে কিনা।

জামাই প্রেম চাঁন্দ জুনাগড় মিউনিসিপ্যালিটিতে খোঁজ করে জানতে পারলেন গীতা নামে একটি মেয়ে ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে মাত্র আড়াই বছর বয়সে মারা যায়। তার বাবার নাম গোকুলদাস থ্যাকার, তাদের বাড়ী জুনাগড়ের টালি ষ্ট্রীটে।

রাজুলের কথাবার্তা কিছুটা সত্য বলে প্রমাণিত হতে তার ঠাকুর্দা ব্যাপারটা আরো অনুসন্ধান করে দেখতে চাইলেন। ১৯১৫ সালে তিনি রাজুল ও অন্য কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে জুনাগড়ে এলেন। রওনা হবার আগে তাঁরা রাজুলের সমস্ত কথা ও নির্দেশগুলো একটা কাগজে লিখে নিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মেয়েটি তাদের পুরানো বাড়ীর কাছে একটা মিষ্টির দোকান আছে বলে বার বার উল্লেখ করে।

জুনাগড়ে পৌছে তাঁরা দিগম্বর জৈনের ধর্মশালায় ওঠেন। কয়েক জন গোকুল দাস থ্যাকারের খোঁজে বেরোলেন। মিউনিসিপ্যালিটির ঠিকানা অনুযায়ী তাঁরা টালি ষ্ট্রীটে গেলেন প্রথমে। রাস্তার মোড়ের মাথায় তাঁরা একটা মিষ্টির দোকান দেখতে পান। সেখানে খোঁজ করতে মিষ্টিওলা কাছেই একটা ন্যায্য মূল্যের দোকানে সকলকে নিয়ে যায়, দোকানের মালিক শ্রীগোকুল দাস থ্যাকার। আগন্তুকেরা গোকুল দাসের কাছে গীতার মৃত্যুর সম্বন্ধে খবর জানতে পারলেন এবং পরে তার স্ত্রী শ্রীমতী কাম্বাবেনের কাছে রাজুলের অন্যান্য খবরগুলো নিয়ে আলোচনা করে ধর্মশালায় ফিরে আসেন।

বিকেলবেলা সকলে আবার গোকুল দাসের বাড়ীতে এলেন। এবার তাঁদের সঙ্গে রাজুল ছিল। কাম্বাবেন বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করলেন রাজুল মহিলাটিকে চিনতে পারে কিনা। একটুখানি ভেবে নিয়ে রাজুল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে, "উনি আমার মা।" সকলে বাড়ীর মধ্যে যেতে রাজুল কাম্বাবেনকে "ভাবী" বলে ডাকে। ভদ্রমহিলা খুবই বিস্মিত হন এই

ডাকেতে। কারণ শুধু তার পরিবারের ছেলে মেয়েরাই তাকে ঐ ভাবে ডাকে। শাহ পরিবারের সকলেও বিস্মিত হত কারণ তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মাকে 'বা' বলে ডাকে 'ভাবী' বলে নয়।

পরের দিন সকলে তারা রাজুলকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। একটা মন্দিরের কাছে এসে রাজুলকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—সে মন্দিরটা চেনে কিনা। রাজুল একটু দূরে একটা বাড়ী দেখিয়ে বলে—কে কে ঐ বাড়ীতে তার মার সঙ্গে আসতো পূজো দিতে। বাড়ীটি বাইরের থেকে সাধারণ, অন্য বাড়ীর মতই দেখতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আসলে সেটা একটা মন্দির, বিভিন্ন পাল-পার্বণের দিনে কেবল খোলে এবং কান্থাবেন সেখানেই আসতেন পূজো দিতে। রাজুলের এই কথা সত্য হওয়াতে সকলে খুবই আশ্চর্য হলেন। গোকুল দাসের বাড়ীতে আবার সকলে যেতে রাজুল অত্যন্ত অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে।

কান্থাবেন রান্নাঘরে চা তৈরি করছিলেন। রাজু সেখানে দৌড়ে চলে যায়, আবদার করে, "মা, আজ আমি তোমার সঙ্গে চা খাবো।"

গীতাই দ্বিতীয় জীবনে রাজুল রূপে জন্মগ্রহণ করেছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে—সঠিক প্রমাণিত না হলেও জন্মান্তরই সম্ভাব্য সম্ভাবনা।

ইটালীর বালিকার ফিলিপাইনে পুনর্জন্ম

লুনা মার্কনি মাত্র তিন বছর বয়সে তার বাবা মাকে জানালো পরিষ্কার ভাষায় যে, সে ফিলিপাইনে তার নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে চায়। এখন মেয়েটির বয়স প্রায় সাত বছরের মত, তারা ডেনমার্কে কোপেনহেগ সহরে থাকে। সে বলে, "তার নাম ছিল মারিয়া ইস্পিনা। তার বাবার একটা রেষ্টুরেণ্টের দোকান ছিল।" সে আরো বলে যে, তাদের বাড়ী ছিল পঞ্চান্ন নম্বর জাতীয় সড়কের ঠিক ওপরে এক গীর্জার ধারে। মাঝে মধ্যে তাদের ওখানে মেলা বসত

আশেপাশের গ্রাম থেকে সকলে মেলায় যোগ দিতে আসতো। সে নিজেও নাকি বহুবার সেই মেলায় গিয়েছিল। ফিলিপাইনদের বিশেষ প্রিয় নারকেল দিয়ে তৈরি মিষ্টি'বোকান' খেতে সে খুব ভাল-বাসতো। সে প্রতি রবিবার গলায় হারে ক্রশের লকেট ঝুলিয়ে গীর্জায় যেত। সে আরো জানালে যে, ম্যাকোপাপালের (ফিলিপাইনের পূর্বতন প্রসিডেন্ট) বক্তৃতা শুনতে তার খুব ভাল লাগতো। সে নাকি জ্বরে ভুগে বার বছর বয়সে মারা যায়।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েটির কথাগুলো যাচাই করে দেখবার জন্য ফিলিপাইন গিয়েছিলেন। সেখানে নানা তথ্য সংগ্রহের পর দেখলেন মেয়েটির সব কথাই হুবহু সত্যি। যে সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সে দিয়েছিল তার কোন খবর আগে থেকে জানা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মেযেটির বর্তমান বাবা-মাও তাকে এব্যাপারে কোনদিন প্রশ্রয় দেননি বরঞ্চ পারত পক্ষে চেষ্টা করতেন সে যাতে পূর্বজন্মের কথাবার্তা বেশী না বলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মেয়েটিকে থামানো যায়নি।

বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে জন্মান্তরের এই যে উদাহরণগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে এর সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক মতামত ইতিমধ্যেই শোনা যায়। খবরের কাগজের মাধ্যমে এই বিবরণ জানার পর লোকে একে "টেলিপ্যাথী" "ভূতেধরা" ইত্যাদি বলেছে।

পরামনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যপথে বিচরণ করছেন। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া কোন একটি দিকে এখনি তাঁরা ঝুঁকতে রাজী নন।

যুগ যুগান্তর থেকে জন্মান্তরের জটিল প্রশ্ন মানুষকে ছলনা করে এসেছে। কয়েকটি ধর্মমত ব্যাপারটাকে চিরাচরিত সত্য বলে মেনে নিয়েছে। অন্য ধর্ম আবার তাকে বাতিল করেছে। কিন্তু কেউই একে বিজ্ঞান সম্মত যুক্তিতে বিচার করেনি। এই চন্দ্র অভিযানের যুগে শুধুমাত্র ধর্ম বিশ্বাসের উপর কোন কিছুর স্থায়িত্ব নির্ভর করে থাকবে এটা মেনে নেওয়া চলে না বলেই পুনর্জন্মের বিষযে ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার। জিনিষটা যদি বুজরুকি বলে প্রমাণিত হয এ ভয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকা চলে না।

ছাত্রারপুরের স্বর্ণলতার কাহিনী

বাবার সঙ্গে জব্বলপুর থেকে শাহপুর (মধ্যপ্রদেশের দুটি শহর) যাবার পথে ছোট্ট মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, "ড্রাইভার সাব, এবার একটা মাত্র মোড় বেঁকলেই আমাদের বাড়ী এসে যাবে।" ড্রাইভার ও মেয়ের বাবা দুজনেই একটু অবাক হয়ে যায়। এ অঞ্চলের কাউকেই তারা চেনে না অথচ মেয়েটা বলছে কি !

মেয়েটির নাম স্বর্ণলতা। বাবা এম, এল, মিশ্র ছাত্রারপুরের (মধ্যপ্রদেশ) সহকারী জেলা স্কুল পরিদর্শক। ছেলেবেলা থেকে স্বর্ণলতা জানায় তার 'আসল বাড়ী' কাটনীতে, সেখানে তার দুটি ছেলে আছে। আঠারো বছর আগে তাদের বাড়ী যেমন দেখতে ছিল তার হুবহু বর্ণনা স্বর্ণলতা দিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল স্বর্ণলতা যে বাড়ীর বর্ণনা দিচ্ছে সেখানে আঠারো বছর আগে বিন্দিয়া দেবী বলে একটি স্ত্রীলোক মারা যায় হার্টফেল করে। বিন্দিয়া দেবীর দুই ছেলে তখনো জীবিত রয়েছে।

স্বর্ণলতাকে কাটনী নিয়ে যাওয়া হলে সে তার দুই ছেলে, আশ-

পাশের অন্য লোকজন ও জিনিষপত্র সনাক্ত করতে পারে। দীর্ঘ আঠারো বছরে বাড়ীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সে সব কিছুই বিস্তারিতভাবে বলে দেয়। স্বর্ণলতা আজও কাটনীতে বিন্দিয়া দেবীর ভাই ও ছেলে মেয়েদের কাছে যাতায়াত করে—নিজের নিকট আত্মীয়ের থেকে সে তাদের বেশি ভালবাসে। তারাও স্বর্ণলতাকে বিন্দিয়া দেবীর আত্মার পুনর্জন্ম বলে মেনে নিয়েছে।

কাটনীর জীবনের ঘটিনা ছাড়াও স্বর্ণলতা আসামে তার সংক্ষিপ্ত এক জীবনযাত্রার কাহিনীও উল্লেখ করে। কাটনীতে মৃত্যুর পর সে প্রথমে আসামে জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু অল্প বয়সে মারা যায়। নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য স্বর্ণলতা বেশ কিছু গান শোনায় শ্রোতাদের যেগুলি আসামের পুরোনো লোকগীতি। স্বর্ণলতা গানগুলি আসামী ভাষাতেই গেযেছিল। আসামী ভাষায় তার গান শেখার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

স্বর্ণলতার কেসটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্যে এক্ষেত্রে আমরা ঘটনাকে তিনটি সম্ভাবনায় ভাগ করতে পারি। প্রথম ঃ ঘটনাটা সম্পুর্ন মিথ্যে সাজানো কাহিনী হতে পারে। দুই ঃ অসৎ উপায়ে জেনে রাখা সংবাদের ভিত্তিতে তৈরী করা ব্যাপার হতে পারে। তিন ঃ এটি আত্মার পুনর্জন্মের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ হতে পারে।

সাজানো কাহিনীর বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে, সে ধরণের কাহিনী প্রচার করে স্বর্ণলতার পরিবার বর্গের কোন উদ্দেশ্য সফল হবে না। এতে তাদের আর্থিক, সামাজিক লাভ বা নাম-যশ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্বর্ণলতা নিজেই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছে। তাছাড়া একটা বাচ্ছা মেয়ে কতদূর মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে বলতে পারে সেটাও বিচার করে দেখা উচিত। সে যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছিল তা বেশ গোলমেলে ও জটিল। কোন মেধাবী মেয়ের পক্ষেও অত খবর বাইরে থেকে জোগাড় করে মাথায় রাখা সম্ভব নয়। এবং এ ব্যাপারে তার বাবা-মা তাকে কোনই সাহায্য

করেননি। এবং তার বাবা-মা সমস্ত বিষয়টাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

কাটনী ও ছাত্রারপুরের দুই পরিবারের মধ্যে আগে কোন আলাপ পরিচয় না থাকায় সে পথে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সে এমন কতকগুলো জিনিষ বলেছিল যেগুলো কেবলমাত্র আঠার বছর আগে ঘটেছিল এবং সেই সব ঘটনার কুশীলব ছাড়া অন্য কারো তা জানা সম্ভব নয়। তার অন্য অনেকগুলো স্মৃতির দাবী আজ-ও যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। এই সব থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় ঘটনাটা কোন সাজানো ব্যাপার নয়।

যেহেতু ঘটনাটি মিথ্যে বা সাজানো কাহিনী নয় সে কারণেই এটাকে অসৎ উপায়ে জেনে রাখা সংবাদের ভিত্তিতে তৈরী করা কাহিনীও বলা চলবে না—কেননা অসৎ উপায়ে সংবাদ সংগ্রহের কোন চেষ্টাই হয়নি কখনো। অতএব তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ জন্মান্তরের ঘটনা বলে মেনে নেওয়া চলে কিনা দেখা যেতে পারে। বালিকাটিকে সম্মোহিত করে কিংবা মনোবিজ্ঞানীকে দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি তাই পুনর্জন্ম বলে এক্ষুণি দাবী করা যাবে না। তবে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে বিচার করার পর এটাকে সাধারণভাবে জন্মান্তরের ঘটনা বলে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু কেমন করে স্বর্ণলতা তার অতীতকে স্মরণ করতে পারছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে এ ব্যাপারে কোন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তাই কাহিনীটি জন্মান্তরের একটি সম্ভাব্য সম্ভবনা হলেও প্রমাণিত সত্য নয়।

গোরখপুরের কৃষ্ণকিশোরের কাহিনী

নিজের যমজ ভাই কৃষ্ণকুমারকে তার অন্য ভাই কৃষ্ণকিশোর প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। ভায়ের সঙ্গে সে সব কিছু ভাগ করে নিতো, তাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারতো না। কেন সে ভাইকে

এত গভীরভাবে ভালবাসে একথা একদিন জিজ্ঞেস করতে কৃষ্ণকিশোর নির্বিকারভাবে জানায় সে তার রাঁধুনি ছিল পূর্ব জন্মে।

ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সে অতীত জীবনের স্মৃতি স্মরণ করতে থাকে। সে মাকে জানায় যে তার এখানকার খাবার আর সে খেতে পারছে না। নিজের বাড়ীতে সে খুবই মুখরোচক খাবার খেত। একটা দোনলা বন্দুক, দুটো গাড়ীর মালিক সে, এবং তার প্রকাণ্ড বাড়ীতে পাঁচ ছেলে ও ছেলেদের বৌ তাকে খুব যত্নআত্তি করতো। তার বাড়ীর মেঝের রং 'লাল' একথাও সে বলতে পারে। সে আরো জানায়, বিগত জীবনে তার নাম ছিল পুরুষোত্তম দাস।

কৃষ্ণকিশোর একদিন মিষ্টি খেতে চাইলে তাকে মা প্লেটে করে চিনি দিতে সে অসীম বিরক্তিতে প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জানায় যে, "তার বাড়ীতে" সে ইচ্ছে মত যত খুশি রসগোল্লা খেতো। সে "বাড়ী" ফিরে যাবার জন্য জেদ ধরতে থাকে।

তার কাকা তাকে নিযে উর্দু বাজারে পুরুষোত্তম দাস নামে এক ভদ্রলোকের সোনার দোকানে নিয়ে যায়। ছেলেটি জানায সেটা তার দোকান নয়। তখন তাকে পুরুষোত্তম দাসের বাড়ীতে নিয়ে যাওযা হলে এ বাড়ী তার নয় বলে সে বেশ জোরের সঙ্গে আপত্তি করে। তারপর একদিন মায়ের সঙ্গে সে অন্য আর এক পুরুষোত্তম দাসের বাড়ীতে যায়। কেতূহলী লোকেদের নানান প্রশ্নে সে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সে জানাল সেটাই তার আগের বাড়ী।

খোঁজ করে দেখা গেল, মৃত পুরুষোত্তম দাসের দুটো গাড়ী ও বন্দুক ছিল। তিনি মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরামনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে চান পুরুষোত্তম দাসই যে জন্মান্তরে কৃষ্ণকিশোর হয়ে জন্মেছেন একথা মন মেনে নিলেও বিজ্ঞান মেনে নেয়নি। তাই তাঁর গবেষণার ইতি টানা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি ঘটনার পর ঘটনা পরীক্ষা করে চলেছেন।

সিংহলের রুবির কাহিনী

জন্মান্তরের ইতিহাস মানব জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসের মত বহু প্রাচীন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনে এর সমর্থন দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্ম স্বীকৃতি পেলেও আত্মার অখণ্ড শাশ্বত অপরিবর্তনীয় রূপকে অস্বীকার করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মে। আত্মাকে মন ও দেহের যৌগিক মিলনসঞ্জাত উপাদান মাত্র হিসাবে দেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল। কিন্তু দেহের বিনাশের সঙ্গে জীবন-ধারার শেষ হচ্ছে না। বরঞ্চ নতুন জীবনের সূত্রপাত হচ্ছে। নিজের কৃতকাজ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি এক সচেতন অনুভূতি রূপে যে কোন মাতৃগর্ভে আশ্রয় নিয়ে বেড়ে উঠছে।

অর্থাৎ পুনর্জন্ম মেনে নিলেও ব্যক্তিক প্রতিনিধিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হল না। তর্কের খাতিরে তাহলে বলতে হয়, একটি নতুন ব্যক্তিজীবন অন্য এক ব্যক্তির কর্মফল অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কিন্তু এটাকে অযৌক্তিক বলেই মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে।

রুবি কুসুমা সিংহলের এক অখ্যাত গ্রাম বাটা পেলোয় ১৯১৫ সালে জন্ম গ্রহণ করে। তার বাবা পোষ্টাফিসে পিওনের কাজ করে, নাম শ্রীশীমন সিলভা। কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই রুবি বিগত জীবনের কথা উল্লেখ করতে থাকে।

সে জানায় গত জন্মে সে ছেলে ছিল। এখানকার বাড়ী থেকে চার মাইল দূরে আলুথাওলাতে তাদের যে বাড়ী রয়েছে সে বাড়ী অনেক বড়। তার বাক্সে ভর্তি জামাকাপড় ছিল। তার আগের মা বর্তমান মায়ের থেকে অনেক ফর্সা দেখতে। তবে প্রথম মা কাপড়ের সঙ্গে গায়ে কোটের মত জামা পরতো—তাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধেই ছিল না। তার এখানকার মা সোমী নোনা মাঝে মধ্যে ছাড়া খাবারের সঙ্গে নারকেল দিতে পারে না বাড়ন্ত থাকে। কিন্তু তার “আসল” মার বাড়িতে নাকি নারকেলের পাহাড় জমানো থাকতো।

মেয়েটি তার বাবা-মাকে বিগত স্কুল জীবনের অনেক ঘটনা জানায়। একদিন সে তার কাকীমার সঙ্গে আলুথওলা নন্দরামা মন্দিরে বেড়াতে গিয়েছিল। মন্দিরের বারন্দায় একটা বইয়ের আলমারী রাখা ছিল। তার পরিষ্কার মনে আছে, আলমারীর কাছে একটা পেন্সিল মাটিতে পড়ে ছিল, তার কাকীমা তাকে সেটা তুলে ফেলতে বলে। মন্দিরের বাগানে বেল গাছের তলায় একটা বেল পড়ে ছিল তারা সেই বেলটা বাড়ীতে নিয়ে আসে।

তার প্রথম বাবার প্রসঙ্গে উল্লেখ করার সময়ে রুবি তার বাবা মাকে জানায়, তার বাবা অনেক বাসগাড়ী চালাত। যখনই বাবা বাড়ী আসতো সঙ্গে ব্যাগ ভর্ত্তি টমেটো আর চিনি আনতো।

তার গত জীবনের মৃত্যুর বর্ণনাটা তার বাবা-মাকে সব থেকে বেশি বিস্মিত করে। রুবি জানায় সেদিন সে মাঠে ফসল কেটে বাড়ী ফিরে কুয়ার ধারে হাত-মুখ ধুতে গিয়েছিল। হঠাৎ পা পিছলে কুয়ার মধ্যে পড়ে যায়। সে জলের মধ্যে কিছুক্ষণ হাত তুলে চিৎকার করেছিল। কিন্তু তার ডাক কেউ শুনতে পায়নি।

রুবির আগের বাবা-মা শ্রীমতী ও শ্রীপুঞ্চিনোনাকে খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। তাদের ছেলে করুণাসেনা ১৯৫৯ সালে মারা যায়। অত্যন্ত বেদনাহত গলায়, চোখের জলে ভিজে তাঁরা ছেলের জলে ডুবে মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করেন, তাঁরা আরো জানালেন রুবির সব কথাই হুবহু সত্যি।

ঘটনার তদন্তকারীরা আলুথাওয়া নন্দরাজা মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করেন। দেখা গেল মন্দির প্রসঙ্গে রুবি যে সব কথা বলেছে তাও সব সত্যি। পুরোহিত তাদের সেই বইয়ের আলমারীটা দেখালেন। মন্দিরের বাগানে সেই বেল গাছও রয়েছে।

সিংহলের আর একটি বিচিত্র ঘটনা

১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে মুগেগোড়ার জয়সেনা পরিবারে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। মাত্র দু'বছর বয়স থেকেই সে তার মার কাছে নালিশ জানাতে সুরু করে, "তুমি আমার আসল মা নও, আমার আসল মা ভিয়ানগোডাতে থাকে।" এই ধরণের অভিযোগে মা কিছুটা দুঃখ পেলেও কথাটায় বিশেষ আমল দেননি।

১৯৬৫ সালে এপ্রিলের কোন একদিন সকালে জয়সেনারা বাসে করে বন্ধুর বাড়ী মাতেলে যাচ্ছিলেন। চব্বিশ নম্বর মাইল ফলক পেরোবার পর হঠাৎ ছেলেটি প্রায় লাফিয়ে ওঠে, "ঐ তো ঐখানে আমার মা থাকে।" বাবা-মা বেশ অবাক হয়ে গেলেও ঠিক করলেন একটু খোঁজ খবর করে দেখবেন। ফেরার পথে তাঁরা একটা গাড়ী ভাড়া করে ছেলে যে জায়গায় অমন চীৎকার করে উঠেছিল ঠিক সেখানে এলেন। এবার কি করবেন ভেবে ঠিক করার আগেই দেখলেন তাদের শিশু পুত্র রাস্তার একদিকে দৌড়তে সুরু করেছে এবং বলছে, "আমার মা এখানে এইদিকে থাকে।" ছেলেটি শ্রীমতী সেনীওয়ারাত্নের বাড়ীর দিকে চলেছে। আশপাশের লোকেদের কাছে শ্রীমতী জয়সেনা জানতে পারলেন সামনের ওপারের বাড়ীতে যাঁরা থাকেন তাঁদের একটি ছেলে বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে।

সেদিন সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার অপরিচিত লোকদের বিরক্ত করা অনুচিত হবে ভেবে তারা আবার সেখানে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন মতে ছেলেকে গাড়ীতে ওঠালেন। পরে ছেলেটির মামা শ্রীবদ্দেগামা থেরো এই ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে শ্রীমতী সেনীওয়ারাত্নের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য তাদের কাছে খুলে বলতে সকলে ঠিক করলেন ছেলেটিকে একবার সেখানে এনে পরীক্ষা করে দেখবেন সে কাউকে সনাক্ত করতে পারে কিনা।

আসবার দিন ছেলেটির হাতে এক বাক্স টফি দিয়ে তাকে বলা

হল সে যেন তার আসল মাকে টফিগুলো সব দিয়ে দেয়। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গাড়ীটি ধীরে ধীরে পাড়ার মধ্যে চলতে চলতে এক মোড়ের কাছে এসে একদিকে বেঁকতেই ছেলেটি বললে, "না না ওদিকে নয়, ওদিকে তো চার্লি কাকারা থাকে। আমাদের বাড়ী অন্য দিককার রাস্তায়।" ছেলেটিকে পথ দেখিযে নিয়ে যেতে বললে, সে সঠিক বাড়ীর কাছে গিয়ে সোজা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। আশে-পাশে বেশ ভীড় জমেছিল, সে সব কিছু লক্ষ্য না করে শ্রীমতী ভিন্নী সেনীওয়ারাত্নের পায়ের কাছে টফির বাক্সটা নামিয়ে রাখে। ছেলেটির ভাব দেখে মনে হল বহুদিন পরে যেন কোন আত্মীয় হঠাৎ তার প্রিয়জনকে দেখতে পেয়েছে। ছেলেটি তার ভাইকে নাম ধরে ডেকে সনাক্ত করে এবং তার 'আসল' মাকে কথাচ্ছলে মনে করিয়ে দেয যে তার এই ভাই একদিন তাকে কিভাবে মেরেছিল। সে চার্লি কাকার ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে খোঁজ নেয় ভাইযের কাছে এবং আশেপাশের কিছু ধান জমি দেখিয়ে বলে সেগুলো তাদের জমি।

সমস্ত বর্ণনা ও কথাবার্তা হুবহু মিলে যেতে শ্রীমতী সেনীওয়ারাত্নে একেবারে হতচকিত হয়ে যান। তিনি স্বীকার করলেন যে, গোড়ার দিকে সমস্ত ব্যাপারটায তার খুব সন্দেহ থাকলেও এখন তাঁর স্থির বিশ্বাস ১৯৬০ সালে মৃত ছেলেই জয়সেনা পরিবারে জন্ম নিয়েছে।

ওপরের দুটো ঘটনাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধরা পাঁচ ধরণের পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে থাকে। তাঁদের মতে মানুষ তার বিগত জীবনের কৃতকর্ম অনুযায়ী পরবর্তী জীবন ধারণ করে, যথা, নরকে জন্ম, পশু জন্ম, প্রেতাত্মারূপে বিচরণ, মানুষ জন্ম ও পরমাত্মায় 'নির্বাণ' লাভ। অর্থাৎ তারা আত্মার শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয় রূপটি মেনে না নিলেও একই ব্যক্তির জন্মান্তরের ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

দ্রুস পরিবারের ঘটনা

জন্মান্তরের এইসব বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে অনুভাবীর (Subject) জাতি, ধর্ম, দেশ ও বয়স যাই হোক না কেন কতকগুলি ব্যাপারে তারা এক হয়ে যাচ্ছে।

যথা, পূর্বজীবনের স্মৃতি অত্যন্ত বাল্য বয়সে দেখা দেয় এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভাবী তা ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে। দুর্ঘটনা, খুন ও এই ধরণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতি বিশেষভাবে মনে থাকে। অবশ্য এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্মৃতিশক্তির ধর্মই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা। সাধারণ জীবনের দৈনিক ঘটনাগুলি আমরা কেউই মনে রাখি না বা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই।

বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কর্নিয়েলের দ্রুস পরিবারের (উত্তর সিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী সম্প্রদায়ের (যাদের ধর্ম বিশ্বাস যুগপৎ বাইবেল ও কোরাণ দুয়ের সংমিশ্রণে রচিত) কাহিনীও রয়েছে। খালিফা-অল-হাকিম ফতিমিদ ১০১৭ সালে জেরুজেলামের গীর্জা ধ্বংস করে নিজেকে পয়গম্বর বলে প্রচারিত করেছিলেন। তিনিই দ্রুস ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। গীর্জা ধ্বংসের এই নাটকীয় ঘটনার পর তিনি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যান। তাঁর অনুরাগী শিষ্যরা জানালেন অল-হাকিম মারা যান নি, তিনি মাহেদীরূপে আবার প্রত্যাবর্তন করবেন।

অল-হাকিমের উত্তরসূরীরা কিন্তু তার অনুরাগীদের উপর খুবই উৎপীড়ন করেন। মুসলমানদের ধর্মের প্রাচীনপন্থীরা দ্রুস সম্প্রদায়কে তাঁদের সমধর্মীয় বলে স্বীকার করতেন না এবং সুযোগ পেলেই নির্যাতন করতেন। দ্রুস সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ধর্মকে কিন্তু মুসলমান ধর্মের অনুগামী বলে মনে করতো এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের অবতার বলে গ্রহণ করেছিল।

আহমেদ আলায়ার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী এক দ্রুস পরিবারের ছেলে। লেবাননের এক ক্ষুদ্র গ্রাম কর্নিয়েলে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালে

সে জন্মগ্রহণ করে। তার বয়স যখন মাত্র দু বছর তখনই সে তার বাপ-ঠাকুর্দাদের জানায় সে আগে কাছের গ্রাম খিরবীতে থাকতো। প্রায়ই সে 'মাহম্মদ' 'জামাইল' ইত্যাদি কতকগুলো নাম বলতো। সে তার বিগত জীবনের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তাদের জায়গা, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বিশদ বিবরণ জানায় সকলকে।

আহমেদ আলায়াবের বাবা এই সব ছেলেমানুষী কথাবার্তার জন্যে তাকে মাঝে মাঝে ধমক দিতেন। কিন্তু তার মা কথাগুলো মন দিয়ে শুনতেন। ফলে ছেলেটি তার মাকে ছাড়া এসব কথা অন্য কাউকে বলতো না। তার মা অবশ্য কোন দিন বিষয়টাকে যাচাই করে দেখার কথা ভেবে দেখেন নি।

ক্রমশ আহমেদ আলায়ার বড় হয়ে উঠতে থাকে। যেদিন সে নিজের পায়ে চলে বেড়াতে শেখে সেদিন কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে সে মাকে বললে, "এই দেখো মা, এবার আমি নিজের পায়ে ঠিক চলতে ফিরতে পারছি।" তার মা এধরণের ইঙ্গিতমূলক ঘোষণাতে কিছুটা বিস্মিত হলেও খুব তলিয়ে দেখতেন না। সে আরো জানায় যে একবার লরীর তলায় চাপা পড়ে তার দুটো পা-ই ভীষণ জখম হয়ে যায়।

শেষে প্রতিবেশীদের প্ররোচনায় আলায়ারের বাবা ও অন্য কয়েকজন তাকে নিয়ে খিরবী গ্রামে আসে। সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় তার বিবরণ ও বর্ণনা ইব্রাহিম বৌগামজী নামে ২৩ বছরের একটি যুবকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

ইব্রাহিম মেরুদণ্ডে যক্ষ্মা হওয়ার জন্য মারা যাবার কিছুকাল আগে থেকে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। একদম হাঁটতে পারতো না। আহমেদ সেই জন্যই হয়তো প্রথম হাঁটতে পারার দিন বিস্ময় বোধ করেছিল পা-গুলো ঠিক মত কাজ করছে দেখে।

আরো জানতে পারা গেল ইব্রাহিম বেশ গভীর ভাবেই, একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছিল তার নাম জামাইল। তাদের বিয়েও ঠিক হয় কিন্তু তার পরেই সে মারা যায়।

অনুসন্ধানের সময় দেখা গেল আহমেদ যে ট্রাক দুর্ঘটনার কথা প্রায় বলতো এবং ট্রাক দেখলেই ভীষণ ভয় পেত সে দুর্ঘটনা কিন্তু তার নিজের জীবনে কোন দিন ঘটেনি। তার গতজন্মের অন্তরঙ্গ বন্ধু শাহিদ বৌহামজী লরীর তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। ইব্রাহিম সে মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল।

আহমেদকে ইব্রাহিমদের বাড়ীতে কতকগুলো ছবি দেখতে দেওয়া হয়, সে তার মধ্যে অনেকগুলোই সনাক্ত করতে পারে। তার বোন হুদা তার কাছে নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে স্বাভাবিক গলায় অবিচল ভাবে জানায়, "হ্যাঁ, তোমাকে চিনতে পারছি, তুমি আমার ছোট বোন।" একটু ভেবে নিয়ে আবার সে বলে, "তোমার নামও আমার মনে আছে, তুমি হুদা।" উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়।

এ জীবনে আহমেদ শিকার করতে যাওয়ার বিশেষ ভক্ত। প্রায়ই বাবাকে ধরে সে বনের ধারে শিকার করতে বা দেখতে যায়। সে জানায় তার একটা রাইফেল ও একটা বন্দুক ছিল—সেগুলো দিয়ে সে বহু শিকার করেছে। ঘটনায় জানা যায় ইব্রাহিম শিকারের বিশেষ অনুরাগী ছিল এবং তার একটি রাইফেল ও একটি বন্দুক বাড়ীতে রয়েছে।

অন্য ঘটনার মত এখানেও সেই প্রশ্ন উঠতে পারে: তবে কি ইব্রাহিম-ই পরবর্তী জন্মে আহমেদ হয়ে জন্মেছে? আমরা জানি না কিন্তু জানবার চেষ্টা করেছি। যতদিন না সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যাবে পরামনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাবেন। সারা পৃথিবীব্যাপী ঘটনার এই ব্যাপকতা তাঁদের উৎসাহ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরনের প্রায় ছয়/সাত শো ঘটনাকে পরীক্ষা করে দেখছেন—এগুলো তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন।

দ্বিতীয় গোপালের কাহিনী

"আমি ব্রাহ্মণ, শর্মাদের বাড়ীর ছেলে—আমার বাবা মথুরায় থাকে।"

"তোমার আর অন্য কোন ভাই-টাই আছে কী?"

"ছিল বৈকি, আমরা তিন ভাই ছিলাম আর ভায়েদের মধ্যেই একজন আমাকে গুলি করে মারে!"

জনৈক গুপ্ত পরিবারের ছেলে তার বাবার সঙ্গে একদিন এই বিচিত্র কথোপকথন সুরু করে। গোপালের জন্ম ১৯৫৬ সালে। কথা প্রসঙ্গে সে জানায় তাদের আগের বাড়ী মথুরার ছিল। সে একটি ওষুধ তৈরীর প্রতিষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করে।

এক্ষেত্রেও ছেলেমানুষের বাচালতা ভেবে প্রথমে তার বাবা-মা বিশেষ কোন আমল দেন নি এই কথাবার্তায়। কিন্তু প্রায়ই গোপাল এ ধরণের কথা বলতে থাকায় তার বাবা বিষয়টা তার বন্ধুদের কাছে তুললেন একদিন। বন্ধুরা জানালেন যে গোপালের কথা সত্যি হতে পারে। কারণ কিছুকাল আগে মথুরায় শুভ সোনিয়ারক কোম্পানীর মালিক শ্রীশক্তি পাল শর্মা গুলির আঘাতে নিহত হন। গোপালের বাবা কিছুটা কৌতূহলী হয়ে শেষ পর্যন্ত মথুরায় গেলেন। সেখানে শক্তি পালের পরিবারের খোঁজ পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না এবং তাদের কাছে খুনের ব্যাপারটা সত্যি বলে জানতে পারলেন।

দিল্লীতে গোপাল নামে একটি ছেলে শক্তি পাল বলে নিজেকে এজন্মে পরিচয় দিচ্ছে একথা জানতে পেরে শক্তি পালের স্ত্রী ও শালী দিল্লীতে এলেন। গোপাল তাদের দুজনকেই চিনতে পারে। সে শালীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে বটে কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে একটাও কথা বলে না। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় স্ত্রীর উপরে শক্তি পাল যথেষ্ট বিরূপ ছিল। "আমি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিলাম একদিন, কিন্তু আমাকে সে তা দিতে রাজী হয় নি, বলেছিল কোম্পানী থেকে জোগাড় করে নিতে। কোম্পানীতে যেতেই আমার ছোট ভাই আমাকে গুলি চালিয়ে খুন করে।"

শক্তি পালের বিধবা স্ত্রী উক্ত ঘটনাটি সত্যি বলে স্বীকার করেন।

গোপালকে এর পরে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য, সে তার পূর্ব পরিচিতদের সকলকে সনাক্ত করতে পারে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা। তাকে দ্বারকাধীশের মন্দিরের কাছে একা ছেড়ে দিয়ে বলা হল তার 'নিজের' বাড়ীতে চলে যায় যেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সকলকে পথ দেখিয়ে শুভ সোনিয়ারক কোম্পানির কাছে এসে জানায়, "এই দেখ এটা আমার দোকান।" তারপর এ-গলি সেগলি দিয়ে এগিয়ে শক্তি পালের বাড়িতে পোঁছায়। "এই হল আমার আসল বাড়ী, আমি উপর তলার একটা ঘরে থাকতাম"—কথাগুলো সে বেশ স্বাভাবিকভাবে জানায়। বাড়ীতে সে শক্তি পালের মেয়েকে সনাক্ত করে। ছেলেটিকে একটি ছবির এ্যালবাম দেখাতে সে তার মধ্যে শক্তি পালের বিভিন্ন সময়ের ও বয়েসের সব ছবি বলে দিতে পারে। এবার তাকে 'তার' মৃত্যুর জায়গাটা জানাতে বলা হয়। সে আবার সকলকে ওষুধের দোকানে নিয়ে এসে সঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। তদন্তের পুঁথিপত্রে শক্তি পালের খুনের জায়গা হিসাবে সেটাই উল্লিখিত ছিল। সে বিশদভাবে জানায়, ঘরের কোন্‌খানে সে এসে ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং গুলিটা কোন্ দিকে এসে তার শরীরের কোথায় লেগেছিল।

শক্তিপালের ছেলে গোপালের কথাগুলি সত্যি বলে জানায়।

ঘটনাটি পরীক্ষা করে দেখা গেলে এটাকে নিছক আবোল তাবোল বা মিথ্যে বলা যাবে না। গোপালের বাবা-মা জন্মান্তরের এই অলৌকিক গল্প বাইরে কোনদিন ঢাক পিটিয়ে জানাতে চান নি। এ ব্যাপারে তাদের কোন ব্যক্তিগত লাভ হয়নি। অতএব এটিকেও স্বাভাবিক জন্মান্তরের ঘটনা বলেই মেনে নিতে হয়।

পাঞ্জাবের মোহিনীর কাহিনী

জন্মান্তরের বহু ঘটনার মধ্যে মোহিনীর কেসটি বেশ আশ্চর্য-জনক। নয় বছরের বালিকা মোহিনীর ধারণা সে আমেরিকার

নিউইয়র্ক শহরে অতীত জীবনে বাস করতো। ঘটনাক্রমে একদিন 'নিউইয়র্ক' শব্দটি বড়দের আলোচনায় শোনা মাত্র তার অতীত জীবনের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সে জানায় প্রায় একশ বছর আগে সে আমেরিকায় ছিল।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েটিকে নিউইয়র্ক শহরে নিয়ে যান ব্যাপারটা আরও বিশদ পরীক্ষা করার জন্য। মেয়েটি তার আগের জীবনের বাড়ী সনাক্ত করতে পারে এবং সেখানকার বহু খুঁটিনাটি বিষয় সে বলতে থাকে।

তিনি মোহিনীকে এর পরে গভীরভাবে সম্মোহিত করে তাকে অতীত জীবনের বহু ঘটনা স্মরণ করতে সাহায্য করেন। উভয় জীবনের ভাষাগত পার্থক্য ও জীবনযাপনের রীতি-নীতির তারতম্য ও দূরত্ব ছাড়াও জন্মান্তরের যে ঘটনা ঘটতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস হিস্ট্রি।

এই সব ঘটনার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে বা হতে পারে কিন্তু সেটা আমরা সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারিনা বলে খুবই অস্বস্তি বোধ করি। পরামনোবিজ্ঞানীরা খুবই ব্যাপকভাবে চেষ্টা করেছেন কারণ খুঁজে বার করার এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সেই কারণটা খুঁজে পেয়ে যাবেন।

বিজ্ঞানসম্মত কারণটা আবিস্কার হলে আমাদের জ্ঞানের জগতে একটা নূতন মাইল ফলক স্থাপিত হবে এবং ধর্মের দিগন্ত অনেক প্রসারিত হবে।

এক.

থেকে

ভাই ভ

দৈনিক 'যুগান্তরে'র, সাময়িকীর পাতায় ১৯১৫ সালে জানুয়ারী থেকে মার্চ, এই তিন মাস আগের অধ্যায়ের লেখাগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি স্বদেশে ও বিদেশে বাঙ্গালী পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন আনে এবং চিঠিপত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আসতে থাকে। চিঠি পত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ব্যক্তিগত ভাবে জবাব দিয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি সেই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে প্রধান কতকগুলি নির্বাচন করে সেগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদাহরণ সহ যে বিশদ আলোচনা করেছিলেন পরে তা ধারাবাহিকভাবে মাসিক বসুমতীতে (আশ্বিন ৭৫··· ফাল্গুন ৭৫) প্রকাশিত হয়েছিল। জন্মান্তরের সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের উত্তর এখানে বিশদভাবে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন কেস হিষ্ট্রির কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ও অন্য নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদিতে যে সব প্রশ্নের উত্তর এখানে ও অন্যত্র দেওয়া হয়েছে তা পাঠকদের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে শেষ অধ্যায়ে পরপর প্রশ্ন ও উত্তরের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শেষ অধ্যায়টিকে (জন্মান্তরের সূত্র সন্ধানে) এই পুস্তকের সারমর্ম বলা যেতে পারে। প্রশ্নগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে এক হলেও সর্বদাই নূতন উদাহরণ বা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে এই লেখাগুলি যখন মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হচ্ছিল সে সময়ে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্ট কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হন। কেনেডির হত্যাকারী পুনর্জন্ম সম্পর্কে কিছু কথা-বার্তা বলতে থাকায় লস্ এঞ্জেলেসের পুলিশ কর্তৃপক্ষ আততায়ীকে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করার জন্য ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন। পরামনোবিজ্ঞানী

হিসাবে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের আন্তর্জাতিক খ্যাতির এটা অসামান্য স্বীকৃতি বলা যেতে পারে।

পুনর্জন্ম কি সত্য সত্যই সম্ভব ?

ব্যক্তি বিশেষের উপরে এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে। যাঁদের এ বিষয়ে বিশ্বাস আছে তাঁরা হয়তো 'হ্যাঁ' বলবেন কিন্তু অবিশ্বাসীদের উত্তর বিতর্কিত হবে। বিদগ্ধ অনুসন্ধিৎসুরা এ প্রশ্নটির সম্ভাব্যতার প্রতি খোলা মনে চিন্তা করেন, এর অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি ভেবে দেখেন এবং তাঁদের ভাবনা চিন্তা থেকে বহুতর প্রশ্নের জন্ম হয়।

কিন্তু দু দলের কাছেই মূল প্রশ্নটি অবান্তর। কেননা এ প্রশ্নের আজ মীমাংসায় পৌছান সম্ভব হয়েছে; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা থেকে পুনর্জন্মের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। প্রশ্নটি তাই তাঁদের কাছে মূল্যহীন। আর যাঁদের আচরিত ধর্মমতে মানব-আত্মার জন্মান্তরের কোন স্বীকৃতি নেই তাঁরা মানব জীবনের সাধারণ শারীরিক ক্ষমতা ও ইন্দ্রিয়ের কার্য-কলাপের সঙ্গে বিষয়টিকে মেলাতে না পেরে হয়তো প্রশ্নটিকে বাতিল করবেন। পুনর্জন্মের সম্ভাবনার মূল প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। উত্তর এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

অষ্ট্রিয়ার ঘটনা

ডাঃ কারমেলা সামোনা ও তার স্ত্রী আদেলার একমাত্র মেয়ে আলেকজেন্দ্রিনা ১৯১০ খৃঃ ১৫ই মার্চ সিসিটি দেশে পানেরমো শহরে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। তার মৃত্যুর তিন দিন পরে তার মা আদেলা স্বপ্নাদেশ পেলেন যে তাঁর মৃত সন্তান আবার তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। শ্রীমতী সামোনা এটিকে প্রথমে অলীক স্বপ্ন ভেবেছিলেন। কারণ কিছুকাল আগে তাঁর শরীরে একটি অপারেশনের পর ডাক্তারেরা সাধারণভাবে জানিয়েছিলেন যে তাঁর আর সন্তান ধারণের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু ১৯১০ খৃঃ ২২শে নভেম্বর শ্রীমতীর দুটি যমজ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে মৃত আলেকজেন্দ্রিনার আকৃতি ও প্রকৃতির মিল থাকায় তারও নাম আলেকজেন্দ্রিনা রাখা হয়। দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিনা প্রথমার মতই শান্ত, নম্র এবং একা একা খেলা করতে ভালবাসতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে দেহগত কিছু মিলও ছিল। তার চোখের কটা ভাব, কানের গড়ন ও মুখের আকৃতি আগের সন্তানের মত হুবহু এক এবং সে প্রথমার মত ন্যাটা ছিল। খাওয়া-দাওয়ায় আলাপে আচরণে স্বভাবে, এমনকি রুচিও এক দেখা গেল।

দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিনা বছর দশেক বয়সের সময়ে মনরিয়েলে বেড়াতে যায়। এর আগে সে কখনও সে অঞ্চলে যায় নি। মনরিয়েলে পৌছান মাত্র সে জানাল যে আগে সে এখানে এসেছে এবং কালো পোষাক পরা ধর্মযাজকদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। শ্রীমতী সামোনার তখন মনে পড়ে যায় যে প্রথম আলেকজেন্দ্রিনার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁরা আর একবার মনরিয়েলে বেড়াতে আসেন ও যে সময়ে গাঢ় নীল পোষাকের উপরে লালের কাজ করা আলখাল্লা গায়ে কয়েকজন গ্রীক্ পুরোহিতের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়।

দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিনার শারীরিক সাদৃশ্য স্বভাবগত ঐক্য ও বিগত জীবনের স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাবার পর ডাঃ সামোনা ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা মানতে বাধ্য হলেন যে, প্রথম আলেকজেন্দ্রিনাই পুনরায় তাঁদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে।

ব্রেজিলের ঘটনা

শ্রীমতী ইভা লরেঞ্জের কন্যা এমিলার মৃত্যুর পর তার মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিল, "মা আমাকে তোমার ছেলে হিসেবে গ্রহণ কর—আমি এবারে তোমার ছেলে হয়ে আসতে চাই।"

এমিলিয়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

১৯০১ খৃঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লরেঞ্জ পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করে।

সন্তানের মধ্যে সেই জ্যেষ্ঠ। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে এমিলিয়া ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করতো। ভাই বোনদের কাছে প্রায়ই কথা প্রসঙ্গে জানাতো যে যদি জন্মান্তর বলে কিছু থাকে তাহলে এবার সে ঠিক ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কুমারী জীবনে একা থেকে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য এমেলিয়া তার বিয়ের সব প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এবং মেয়ে জন্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে কয়েকবারই আত্ম-হত্যার চেষ্টা করে। উনিশ বছর বয়সে ১৯২১ খৃঃ ১২ই অক্টোবর অবশেষে সে সাইনাইড বিষ খেয়ে মারা যায়।

এমিলার মৃত্যুর পর শ্রীমতী লরেঞ্জ প্লানচেট ইত্যাদি আলোচনা-চক্রে যোগদান করে এমিলিয়ার আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এমিলিয়া আত্মহত্যা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, সে আবার পরিবারের মধ্যে ফিরে আসতে চায় ছেলে হয়ে।

শ্রীমতী লরেঞ্জ ব্যাপারটি তাঁর স্বামীকে জানান। মিঃ লরেঞ্জ বিষয়টিকে অবাস্তব বলে মনে করেছিলেন। এমিলিয়ার পুনর্জন্ম গ্রহণে আর একটি বাধা ছিল। লরেঞ্জ দম্পতির সন্তান-সন্ততির সংখ্যা সে সময়ে বারো এবং শ্রীমতী লরেঞ্জের গর্ভধারণের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব অবিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে ১৯২৩ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা জ্যেষ্ঠ কন্যার নামানুসারে ছেলেটিরও নাম রাখেন এমিলিয়া, তবে সাধারণভাবে ছেলেটি পাওলো নামে পরিচিত হয়।

বালক পাওলোর আচার-আচরণে মৃত এমিলিয়ার বহু মিল ছিল। বালক বয়সেই সে সেলাই-এর কাজে আশ্চর্য দক্ষতা দেখায়। প্রথম চার-পাঁচ বছর সে কিছুতেই ছেলেদের পোষাক পরতে রাজী হতো না এবং মেয়েদের জামা কাপড় পরতে ভালবাসতো। মাঝে মাঝে সে এমন কথা বলে ফেলতো সেগুলোর সঙ্গে মৃত এমিলিয়ার যোগাযোগ ছিল। পাওলোর পাঁচ বছর বয়সের সময় এমিলিয়ার ফ্রকের কাপড় কেটে তাকে একটি ছেলেদের পোষাক করে দেওয়া হয়। সেটি তার পছন্দ হয় এবং এর পর থেকেই সে ক্রমশঃ ছেলেদের

জামা-কাপড় পরতে সুরু করে। তার স্বভাবেও তারপর বালিকা সুলভ আচরণ কম হতে থাকে। অবশ্য কৈশোর পদার্পণের আগে পর্যন্ত তার আচরণ সম্পূর্ণ পুরুষোচিত হয়নি।

পুনর্জন্মের ঘটনার প্রাচুর্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই দেশের পুনর্জন্মের কাহিনী ও অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করা হল। সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বাস করে থাকেন ভারতবর্ষেই এ ধরণের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা কোন বিশেষ একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মান্তরিত ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এ সব থেকে একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে আত্মার পুনর্জন্ম সম্ভব এবং এ সম্পর্কে জনসাধারণের ঔৎসুক্য অন্যান্য বিজ্ঞান চেতনার মতই স্বাভাবিক।

বিশ্বাসের সঙ্গে পুনর্জন্মের কোন যোগাযোগ আছে কি?

পুনর্জন্মের সম্ভাবনা জনসাধারণের বা সমাজের প্রবল বিশ্বাস প্রভাবান্বিত হতে পারে। সে কারণে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এলাকায় এ ধরণের ঘটনার খবর তুলনামূলক ভাবে বেশী পাওয়া যায়। অনুকূল সামাজিক পরিবেশ বা আবহাওয়া অনুভাবী ব্যক্তির অতীত জন্মের স্মৃতি স্মরণে আনার সহজাত সুযোগ করে দেয়। বিপরীত অবস্থায় তার বিগত স্মৃতি হয়ত জাগরিত না হতেও পারে। একজন চিত্র-শিল্পীর ছবি আঁকার জন্যে যেমন ষ্টুডিওর পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে, সে রকম স্মৃতি-শক্তি পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সমধর্মীয় পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে, অবশ্য জন্মান্তরবাদে একদম বিশ্বাস নেই এমন অঞ্চল থেকেও জন্মান্তরের খবর পাওয়া গেছে।

বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা জেরুজালেমের একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। সেখানের ধর্ম-আচরণে এই মতবাদের কোন স্বীকৃতি নেই।

জেরুজালেমের ঘটনা

শহরের দাঁতের ডাক্তারের ছ' বছরের ছেলে ডেভিড মরিস প্রায়ই জানাত যে, সে তার পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করতে পারে। তার মতে সে অতীতের রাজা ডেভিড, যিনি তিন হাজার বছর আগে ইহুদীদের প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে একটি সুদৃশ্য মন্দির স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে সে মন্দিরের সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেলেও পশ্চিম দিকের বিধ্বস্ত দেয়ালটি জেরুজালেম শহরে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বালক ডেভিডের ঘটনাটি এই রকম—

ডাঃ শ্যামে মরিস একদিন তাঁর ডাক্তারখানায় ব্যস্ত রয়েছেন। হঠাৎ তাঁর স্ত্রী এডনা অত্যন্ত চিন্তিত মুখে এসে জানালেন যে ডেভিডকে একজন মনোবিদেব কাছে নিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার।

এডনা জানালেন, "ডেভিডেব জন্য আমি বড় ভাবনায় পড়েছি। সে মোটে আর স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে না। মাঝে মাঝে কি রকম আচ্ছন্নের মত হয়ে যায় এবং বিড় বিড় করে কি সব আবোল-তাবোল বকতে থাকে। আমি ভাবতাম ও বুঝি আমাকে বিরক্ত করার জন্য অমন করছে, কারণ অন্য বন্ধুদের সঙ্গে অথবা তুমি যখন বাড়ী ফের তখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে। আমি বকাবকি করলে তো আরো বিগডে যায়। আমার মনে হয় আমাদের এখুনই কোন সাঃকোলজিস্টের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। নইলে হয়তো ডেভিড ক্রমশ 'মাথা-পাগলা' ছেলে হয়ে যাবে।"

ডাঃ মরিস সেদিনের সব কাজ ফেলে রেখে স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ী ফিরে এলেন। ছেলে ডেভিড তখন বসবার ঘরে কার্পেটের উপর কাঠের ব্লক (খেলনা) দিয়ে দুর্গের মত একটা কিছু তৈরী করতে ব্যস্ত। শ্রীমতী মরিস ডেভিডকে বকতে লাগলেন, "তোমাকে না কতবার বারণ করেছি এঘরে খেলা করবে না—নিজের ঘরে খেলবে। তোমার জ্বালায় এই দামী কার্পেটটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।"

ডাঃ মরিস কিছুই বললেন না। ডেভিডের তৈরী করা ঘর বাড়ীর প্যাটান টা তাঁর খুব পরিচিত মনে হল। তিনি ভাবতে

লাগলেন কিসের সঙ্গে এর মিল আছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল কয়েক সপ্তাহ আগে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে দেখা পুরাতন 'প্রথম পবিত্র দেবালয়ের' (first Holy Temple of God) একটি রেখা চিত্রের সঙ্গে এটির আশ্চর্য মিল রয়েছে। কিন্তু ডেভিড তো সেই দুষ্প্রাপ্য ছবি দেখেনি—তাহলে সে কি করে এটা করল?

ডাঃ মরিস তাঁর অভিনিবিষ্ট ছেলের পাশে চেয়ার টেনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ডেভ, এটা তুমি কি করছো? কোন একটা রেলের ষ্টেশন না কি?" তাঁর গলায় আদরের সুর।

শিশু ডেভিড তাঁর দিকে ফিরে তাকালো—তার সুন্দর নীল চোখ দুটি মনে হল তখন কোন সুদূরের চিন্তায় মগ্ন। বন্যার স্রোতের মত শব্দের তোড়ে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ডাঃ মরিস সেই দুর্বোধ্য শব্দের কিছুই বুঝতে পারলেন না। কেবল প্রাচীন হিব্রু ভাষার একটি শব্দ, যেটার অর্থ তিনি জানতেন, এ থেকে বুঝতে পারলেন ডেভিড 'মন্দির' কথাটি বার বার বলছে।

স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তিনি টেপ রেকর্ডার আনতে বললেন এবং ডেভিডের দুর্বোধ্য কথাগুলো রেকর্ড করে নিলেন। বালক ডেভিড হঠাৎ এক বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে উঠে লাথি মেরে সেই খেলাঘরের ছবিটি ভেঙ্গে তার ঘরে ছুটে চলে গেল।—"দেখলে তো কি রকম হয়ে উঠেছে ছেলেটা দিন দিন।" শ্রীমতী মরিস স্বামীকে অনুযোগ করলেন।

ডাঃ মরিস টেপটি নিয়ে তখনি ন্যাশনাল মিউজিয়ামে গেলেন। মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ ভি. হারমাদ (Dr. Zvi Hermaun) ডাঃ মরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। হারম্যান জেরুজালেমের পৌরাণিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ এবং এদেশের প্রচলিত পুরোনো নতুন প্রায় সকল ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে। তিনি মাটির তলায় পাওয়া হাজার হাজার বছরের প্রাচীন শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

ডাঃ মরিস তাঁর ছেলের সম্বন্ধে বন্ধুকে কিছু না বলে টেপটি

চালিয়ে দিলেন। রেকর্ডারের মধ্যে দিয়ে ডেভিডের সেই দুর্বোধ্য শব্দগুলি তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল। ডাঃ হারমান টেপটি প্রথমবার শোনার পর চিন্তান্বিত হলেন—বারবার সেটি চালালেন, কখনও ধীরে ধীরে কখনও জোরে—বিভিন্নভাবে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকার পর একটা কাগজ টেনে কিছু লিখলেন।

লেখা শেষে বললেন,—"এটা বহুকাল আগের প্রচলিত হিব্রু বলে মনে হচ্ছে। বর্তমানের সঙ্গে কিছু কিছু শব্দের মিল থাকলেও এর ক্রিয়ার ব্যবহার, উচ্চারণ-ভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাসে অনেক তফাৎ আছে। এ ভাষাটি আমি পুরোপুরি এখনো রপ্ত করে উঠতে পারিনি, তবু আমার মনে হয় প্রথম কয়েকটি লাইনের মানে হল এই রকম: "আমি এই রাজ্যের রাজা" তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি; আমার প্রতি অনুগত থাকো, আমি তোমাদের গৌরবের পক্ষে চালিত করবো।"—"কিন্তু তুমি এটা কোথায় রেকর্ড করলে? শুনে মনে হয় কোন পেশাদার অভিনেতা ঐতিহাসিক নাটকের পার্ট রিহার্শাল দিচ্ছে।"

ডাঃ হারমান বলে চললেন,—"রাজা ডেভিড আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইস্রায়েলে রাজত্ব করতেন। তিনি যখন জেরুজালেমে ঈশ্বরের প্রথম মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেন, তখন পণ্ডিতদের একদল প্রবল বিরোধিতা করে। কিছুটা মন্দির গড়ে ওঠার পর রাজাকে বাধ্য হয়ে পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করতে হয়। পরে তাঁর উত্তরসূরী রাজা সোলেমান সেই মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন। নাটকের পক্ষে প্লটটা ভাল, কিন্তু আমাদের দেশের কোন অভিনেতা পুরোনো হিব্রু জানে তাতো জানতাম না। সত্যি বলতে কি, জানা নয়, এমন অনর্গল ও নির্ভুলভাবে পুরোনো হিব্রু কেউ লিখতে বা বলতে পারে এমন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। যাই হোক, ভদ্রলোকটি কে? আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

ডাঃ মরিসের ততক্ষণে মাথা ঘুরতে সুরু করে দিয়েছে। অত্যন্ত

বিমূঢ়ের মত তিনি বললেন,—"আমার ছেলে, আমার তিন বছর বয়সের ডেভিড কিছুক্ষণ আগে এ-কথাগুলো বলেছে।"

এবারে অবাক হবার পালা ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ ভি হারম্যানের। তিন বছর বয়সের বালক ডেভিড মরিসের শরীরে তিন হাজার বছরের ও অতীতের আত্মার পুনরাবির্ভাবের এই অবিস্মরণীয় কাহিনীর সূত্রপাত ১৯১৫ খ্রীঃ জুলাই মাসের এক সকালে এভাবে হয়েছিল।

ডাঃ মরিস তাঁর ছেলেকে সুপ্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাপক ইব্রাহিম তারবাকের এবং ডাঃ জারস্মানের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল রাখলেন। পরীক্ষকেরা লক্ষ্য করলেন ডেভিডের ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ থাকলে সে স্বাভাবিক আচরণ করে কিন্তু জানালা খোলা থাকলেই তার মাঝে মাঝে একটা আচ্ছন্ন ভাব আসে এবং সে সেই আগের দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে থাকে।

তাঁরা আরো লক্ষ্য করলেন যে হাওয়ার গতিবেগ উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যখন প্রবাহিত হয় তখন ডেভিডের এই আচ্ছন্ন-ভাব আরো বেশী ঘন ঘন হতে থাকে। জেরুজালেমের একটি প্রাচীন মানচিত্রে বায়ুর এই গতিপথ নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল রিহাভিয়া কোয়ার্টারে ডাঃ মরিসের বর্তমান বাড়ীর মাইল দুই উত্তর-পূর্বে পুরানো জেরুজালেমের মাউণ্ট ফেরিয়া পর্বতের অবস্থান। এই পাহাড়েই তিন হাজার বছর আগে রাজা ডেভিডের দুর্গ এবং তাঁর প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্তই তাঁদের রিপোর্টে লিখলেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন না।

জন্মান্তরের ঘটনা বাস্তব না কল্পনা?

পুর্নজন্মের ঘটনার বিভিন্ন কাহিনী জনসাধারণের মনে সম্প্রতি গভীর রেখাপাত করেছে। আমরা এখানে ইটালী ও জাপানের দুটি

ঘটনা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবো। ইটালীর ঘটনার সঙ্গে মানসিক হাসপাতালের একজন অধ্যক্ষ যুক্ত রয়েছেন। তিনি অন্তত বিষয়টি আজগুবী, কল্পনা না সত্য বলতে পারবেন। তাছাড়া ঘটনাটি অন্য একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ—ইটালীতে জন্মান্তববাদকে 'বুজরুকী' বলে মনে কবা হয় এবং এধরণের ঘটনাকে কোন মূল্যই দেওয়া হয়না।

ইটালীর কাহিনী

ডাঃ গ্যাসাটোন উগুকৈনি ইটালীব ফ্লোরেন্স সহরে এক মানসিক হাসপাতালেব অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি অবসব গ্রহণ করাব পর নিজে একটি ক্লিনিক খুলেছিলেন। তিনি জানালেন যে তাঁব ধারণা বিগত জীবনে তিনি মাদ্রাজেব কাছে মহাবলীপুবমে কোন মন্দিবেব পুবোহিত ছিলেন।

সাত-আট বছব বযসেব সময তিনি বেশ পবিষ্কাবভাবে স্বপ্নে দেখেন যে তিনি পৌবোহিত্যেব কাজ কবছেন। সেই স্বপ্ন পবে আবো দু'তিন বাব দেখেছেন। সে সময়ে তিনি মহাবলীপুরম সম্পর্কে কিছু জানতেন না। এবং তাঁব সে সময়েব পবিচিতেরাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতো না।

ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষযে প্রচুব উৎসাহ ও শ্রদ্ধা অনুভব করতেন বলে তিনি ভারতীয় দর্শন নিয়ে পড়াশোনা সুরু করেন। যুবক বয়সে তিনি ভারতবর্ষে আসবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। অবসর গ্রহণেব ছ'বছর আগে তিনি ভারতে আসার প্রথম সুযোগ পান। সে সময়ে তিনি মহাবলীপুরমে (দাক্ষিণাত্যে) বেড়াতে যান। তিনি কয়েকটি অতি পুরানো মন্দির সনাক্ত করতে পারেন এবং জানান যে আরো অনেকগুলো মন্দির নাকি সেখানে ছিল। সেগুলি হয়তো সমুদ্র স্রোতে ক্রমশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তিনি বললেন—"সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমার আগ্রহ এর পরে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, বছরের পর বছর তা আরো বেড়ে চলে।"

ডাং উগুকৈনি জানান -"আমি যখন মহাবলীপুরমে বেড়াতে যাই তখন সেখানের মন্দিরের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুভব করতে পারি। আজ সেই ছেলেবেলার স্বপ্নকে খুব বেশী আমল না দিলেও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি বিগত জীবনে এখানকার কোন একটি মন্দিরের পূজারী ছিলাম। আমি অজন্তার গুহা ও ভারতের অন্যান্য বহু স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলি দেখেছি কিন্তু মহাবলীপুরমের মত মনের অবস্থা কখনও আমার হয়নি।"

ডা. উগুকেনের এই ঘটনা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা পুনর্জন্ম বাস্তব না কল্পনা এই প্রশ্নের উত্তরের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষযটি রীতিমত গবেষণার দাবী রাখে।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশ জাপান জন্মান্তরবাদে গভীর আস্থা রাখে এবং সেখান থেকে বহু ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। জাপানের একটি কাহিনীর উল্লেখ এখানে করা চলতে পারে।

জাপানী পুনর্জন্মের কাহিনী

জাপানের নালা ভোমুরা গ্রামে গেজনো নামে এক চাষী পরিবারে ১৯৩৫ খৃ. ১০ অক্টোবর বালক কাটাসুগুরোর জন্ম হয়। তার বয়স যখন সাত-আট বছর তখন সে জানায় অতীত জীবনে তার নাম ছিল 'তেজো' এবং পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে কুব্যেই ও শিড্জু। তারা হোডোবুরোতে থাকতো। পাঁচ বছর বয়সের সময় তার পিতার মৃত্যু হয় এবং হাউশিরো নামে এক ভদ্রলোককে তার মা পুনরায় বিয়ে করে।

কাঠসুগুরো আরো জানায় গত জীবনের ছ' বছর বয়সের সময় বসন্ত রোগে তার মৃত্যু হয়। সে তার আগের বাবার

সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হেডোবুরোতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে।

কাটস্গুরোর ঠাকুমা তাকে হেডোবুরো শহরে নিয়ে যায়। ঘটনায় প্রকাশ যে, শহরে যাবার পর কাটস্গুরো পথ দেখিয়ে আগে আগে নিয়ে যেতে থাকে এবং একটি বাড়ীর সামনে এসে জানায় সেটা তাদের বাড়ী। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, বাড়ীতে হাউশিরো ও শিডজু নামে এক দম্পতি বাস করে এবং তাদের মৃত সন্তানের নাম ছিল তেজো। কাঠস্গুরো ও তার ঠাকুমা এখানে বেড়াতে আসার প্রায় তেরো বছর আগে বসন্ত রোগে ছ' বছর বয়সে তেজোর মৃত্যু হয়েছিল।

সে কাটস্গুরো শহরের বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা বলে এবং পরীক্ষার পর সেগুলো সঠিক বলে জানা যায। এই সমস্ত প্রমাণ থেকে এটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে কাটাস্গুরো পূর্বজন্মে তেজো ছিল।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী জনসাধারণদের দেখা গেছে অত্যন্ত দুর্বল ঘটনাগুলিকেও পুনর্জন্মের ব্যাপার বলে মেনে নেন সহজেই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞান সচেতন হয়েছে। সে কারণে আবার বহু সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনাও অবান্তর বলে পরিত্যাজ্য হয়েছে। এর অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে, লোকে এখন প্রবল বিশ্বাসযোগ্য তথ্য না পেলে এবং ব্যক্তিগতভাবে চোখে না দেখলে ও শুনলে কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। তবু-ও আজকের দিনেও জন্মান্তরের ঘটনাবলীর প্রতি সারা বিশ্বের মানুষেরা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং কিছু বিজ্ঞানীরাও এদিকে ভেবে দেখতে সুরু করেছেন।

অতীতের কয়েক জন দিকপাল বৈজ্ঞানিক পুনর্জন্মের বিষয়টি সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। টমাস হাক্সলে ও টমাস এডিসন এঁদের মধ্যে অন্যতম। টমাস হাক্সলের মতে ঃ

"পুনর্জন্মের সূত্রটি বাস্তবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র

অস্থির চিত্তের ভাবুকরাই একে চিরাচরিত অবাস্তবতার যুক্তিতে বাতিল করবেন।"

পুনর্জন্মের স্মৃতির অধিকারীরা দুই জীবনের নিকটতম অঞ্চলে কেন জন্ম গ্রহণ করে ?

জন্মান্তরের যে সব ঘটনার খবর সচরাচর পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে যে গবেষণাধীন ব্যক্তি এবং পূর্ব জীবনের যে ব্যক্তির কথা সে উল্লেখ করছে উভয়েই নিকটবর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে। যেমন এই নীচের উদাহরণটিতে দেখা যাবে—

মথুরার প্রকাশের কাহিনী

"তুমি তো জাঠ দেশের মেয়ে—তুমি আমার মা নও। আমি আমার আসল মায়ের কাছে চলে যাবো।"

মথুরা জেলার কোশিকালান গ্রামের শ্রীভোলানাথ জৈনের ছেলে নির্মল একদিন এ-কথা তার মাকে বলেছিল। বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী নির্মল তখন মৃত্যু পথযাত্রী। কথা বলার সময় ছাট্টা নামে একটি গ্রামের দিকে সে হাত বাড়িয়ে নির্দেশ দেয়। কোশিকালান থেকে মথুরা যাবার পথে মাত্র ছ'মাইল দূরে ছোট্ট গ্রাম হল ছাট্টা। ঘটনাটি ১৯৫০ খৃঃ এপ্রিলের কথা।

১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে ছাট্টায় শ্রীবি এল ভার্সানের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ছেলের নাম রাখা হল প্রকাশ। চার বছর বয়সে প্রকাশ একদিন জানায়, "আমার বাড়ী কোশিকালান গ্রামে। আমার নাম নির্মল। আমি আমার পুরোনো বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই।"

রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে সে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতো। চার-পাঁচ দিন একাদিক্রমে এইভাবে থাকতো। তারপর কিছুদিন শান্ত থাকার পর আবার পালাবার চেষ্টা শুরু হত। ছেলের বাসনা ক্ষান্ত করার জন্যে তার কাকা একদিন কোশিকালান যাবার নাম করে মিথ্যা উল্টো দিকের বাসে চাপবার জন্য প্রকাশকে নিয়ে যায়। কিন্তু সে ভুল ধরে দেয় এবং কাকাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই কোশিকালান রওনা হতে হয়। এটা ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের ব্যাপার।

সেই প্রথম পাঁচ বছরের প্রকাশ কোশিকালানে যায়। প্রথম যাত্রায় অবশ্য কিছুই ফল হয়নি। কারণ নির্মলের বাবা শ্রীভোলানাথ জৈন না থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এই সময়ে কিন্তু নির্মল জীবনের বহু ঘটনার কথাই প্রকাশ মনে করতে বা বলতে পারতো। ক্রমশ সময়ের ব্যবধান বাড়তে থাকায় স্মৃতি ম্লান হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু কোন সময়েই সে নির্মলের কথা একেবারে ভুলে যায়নি। অবশ্য অন্য একটা কারণ-ও ছিল এই স্মৃতি লোপের ... কুসংস্কার ও ভয়ের জন্য শ্রীভার্সনাই প্রকাশকে নির্মলের প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে না ও দিতেন এবং এ ব্যাপার ভুলে থাকার জন্য প্রকাশের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কালক্রমে এমন মনে হতে লাগল যে প্রকাশ হয়তো নির্মলের কথা একেবারেই ভুলে গেছে। অন্ততঃ তার মুখে নির্মলের কোশিকালানে যাবার কোন কথা আর শোনা যায়নি।

১৯১৫ সালে শ্রীভোলানাথ জৈন, ছাত্রীর প্রকাশ তাঁর মৃত পুত্র নির্মলের কথা বলতে পারে জানতে পারায় প্রকাশকে দেখতে আসেন। শ্রীজৈনকে দেখা মাত্র প্রকাশ 'বাবা' বলে চিনতে পারে। কিছুকাল পরে নির্মলের মা নির্মলের ভাই দেবেন্দ্র এবং বোন তারামতী প্রকাশকে দেখতে আসে। তাদের দেখে কোশিকালান যাবার জন্য প্রকাশ ভীষণ কান্নাকাটি সুরু করে দেয়। শ্রীমতী জৈনের সানবন্ধ অনুরোধে প্রকাশের বাবা যাবার অনুমতি দেন।

বাস থেকে নামার পর প্রকাশ পথ দেখিয়ে সকলকে নির্মলের বাড়ীতে আনে। সে পরিবারের অন্য সকলকে সনাক্ত করে এবং বাড়ীর অনেক কিছুই ঠিক ঠিক বলে। এই দ্বিতীয়বার কোশিকালান আসার ফলে প্রকাশ আবার নির্মলের কথায় মত্ত হয়ে ওঠে এবং পুনরায় রাত্রে ঘুম থেকে উঠে পালাবার চেষ্টা করে।

এই ঘটনায় দুটি চরিত্র কাছাকাছি জন্ম গ্রহণ অতীত জীবনের স্মৃতি স্মরণে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলেও প্রতি ক্ষেত্রে এই স্থান

ও কালের নৈকট্য থাকে না। এমন অনেক ঘটনা জানতে পারা গেছে যারা দুই জন্মে পৃথিবীর দুই প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেছে।

কিউবার শ্রীমতী র‍্যাচেলের কাহিনী

শ্রীমতী র‍্যাচেল গ্রাণ্ড আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে বর্তমানে বাস করেন। তাঁর বয়স প্রায় ২৬ বছর এবং জন্মস্থান কিউবা। তাঁর প্রায়ই মনে হত তিনি ইউরোপের কোন দেশে আগের জীবনে নর্তকী ছিলেন। এক সময়ে তিনি অতীত জীবনের নামও মনে করতে পারলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল সেই নামে এক নর্তকী পঞ্চাশ বছর আগে স্পেনের থিয়েটারে নাচতো।

শ্রীমতী র‍্যাচেলের অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি প্রায় জন্ম নর্তকী। কারোর কাছে না শিখেই তিনি নৃত্য কুশলী ছিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডের ঘটনা

গ্যাব্রিয়েল উরিবের কাহিনী বেশ বিচিত্র, বয়স বত্রিশ, নিবাস সুইজারল্যাণ্ড। নিজের দেশের জীবন যাপন প্রণালী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বহুকাল থেকেই তার এক ধরণের বিরক্তি ও অসন্তোষ ছিল। পক্ষান্তরে অশ্বেতকায় দেশবাসীদের উপর তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াবার সময় গ্যাব্রিয়েল স্পেন দেশেও যায়। সেই দেশ ভ্রমণের সময় হঠাৎ সে তার পূর্ব জীবনের সব কথা মনে করতে পারে। সে জানায় যে পূর্ব-জীবনে সে কলম্বিয়ায় রাজনীতি করতো। তার নাম মিল উ র‍্যাকেল এবং স্ত্রীর নাম ছিল সিস্টা টুলিযা। তার বিগত জীবনের দুই সন্তানের নাম ছিল জুলিয়ান্ত ও মাবিয়া।

১৯:৪ খৃঃ কলম্বিয়ায় আততায়ীর কুঠারের আঘাতে সে মারা যায়। আক্রমণকারী তার কপালে আঘাত করে ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এ জন্মে গ্যাব্রিয়েলের কপালে ঠিক সেই জায়গায় এক বিকৃত ক্ষতের দাগ আছে। এ জীবনে সে কোন ভাবেই মাথায় আঘাত পায়নি এবং দাগটি জন্ম থেকেই ছিল।

উপরের ঘটনাগুলিতে দেখা যায় পুনর্জন্মের ঘটনা দুই জন্মে বিভিন্ন দেশে হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্নের শুরুতে যে প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে তা অংশত ঠিক নয়।

অবশ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির সমধর্মিতা স্মৃতিকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। সমগোত্রীয় ও সমান্তরাল বিষয়বস্তু অতীত স্মৃতি জাগরিত করতে সহজাত সুযোগ এনে দেয়।

'ল অফ এ্যাসোসিয়েশন' অনুভাবীর অতীত জীবনের ইতিকথা স্মরণে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। আমেরিকার একটি শিশু ভারতবর্ষে অতীতে জন্মগ্রহণ করে থাকলেও আজ আর এ দেশের বিশেষ কোন খাদ্যবস্তুর বর্ণনা করতে পারবে না যদি না সে সেই খাদ্যবস্তু আবার খায় বা দেখতে পায়।

এই দেখা বা খাবার সময় 'ল অফ এ্যাসোসিয়েশন'-এর কার্যকারিতায় তার বিগত জীবনের স্মৃতি জাগরিত হতে পারে। এই নীতি অনুকূল পরিবেশে বেশি কার্যকর বলে আমরা দূর দেশের চেয়ে কাছাকাছি স্থানে এ ধরণের ঘটনার বেশি খবর পাই, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও প্রচুর রয়েছে।

একের অধিক অতীত জীবনের কথা স্মরণের ঘটনা আছে কি ?

পৃথিবীর বহু দেশ থেকে এমন অনেক ঘটনার খবর পাওয়া যায় যে ক্ষেত্রে অনুভাবী ব্যক্তি একাধিক অতীত জীবনের কথা বলতে পারে। অতি সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। উদাহরণ হিসেবে সেটা উল্লেখ করা যেতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রিটোরিয়া শহরের তেরো বছরের বালিকা জোয় ভারতয়ে অত্যন্ত স্থির নিশ্চিত ভাবে তার বিগত জীবনের ঘটনা বলতে পারে। তার বিবৃত কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তার বিভিন্ন জন্মকাল প্রস্তর যুগ, খৃষ্টপূর্ব রোম, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালি, সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তমাশা অন্তরীপের বুশম্যান সম্প্রদায়ের জীবিতকাল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট

পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সময়ের মধ্যে বিস্তৃত। কথা প্রসঙ্গে সে বলে যে, তার কোন এক জীবনে সে কৃতদাসী হয়ে ছিল।

জোয় যখন সবেমাত্র কথা বলতে ও লিখতে আরম্ভ করে, তখন থেকেই সে তার অতীত জীবনের কথা বলতে থাকে। কখনো গল্পে, আবার কখনো ছবি এঁকে সে এসব বোঝাত। কিন্তু তার সে সব আচরণ শিশুর অলীক কল্পনা হিসেবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। সম্প্রতি মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখতে চেষ্টা করেছেন যে, সত্যি সত্যিই জোয় এতগুলো জন্মের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে কিনা। মেয়েটি যেমন জানিয়েছিল—

এক। অতিকায় জন্তু, ডাইনোসোরাস (প্রস্তর যুগে জীবিত ছিল) তাকে তাড়া করে।

দুই। সে যখন কৃতদাসী ছিল তখন তার গলা তরবারি দিয়ে কেটে ফেলা হয়।

তিন। রোমের প্রাসাদে থাকার সময়ে সে সিল্কের সূতো দিয়ে গায়ের চাদর বুনতো।

চার। ভগবানের পুত্র বলে পরিচিত কোন ধর্ম প্রচারককে (সম্ভবত যীশুখৃষ্ট) সে পাথর ছুঁড়ে মারে।

পাঁচ। যে দেশে ঘরের দেওয়ালে এবং ছাদে বিরাট বিরাট তৈলচিত্র আঁকা হয়ে থাকে, সে দেশে সে বড় হয়েছে (ইতালিতে পুনর্জাগরণের কাল—Renaissance)।

ছয়। ক্ষুদ্র পীতকায় লোকদের সঙ্গে থাকার সময়ে শিশু বয়সে বালির তলা থেকে পশু-পক্ষীর ডিম বার করতো। (সপ্তদশ শতাব্দীর আফ্রিকার বুশম্যান সম্প্রদায়ের অভ্যাস)।

সাত। ১৮৮৩ খৃঃ থেকে ১৯০০ খৃঃ ট্রান্সভাল রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট স্টীফান্স জোহন্স পাওলার্স ক্রুগারের সঙ্গে প্রায়ই সে দেখা সাক্ষাৎ করতো।

জোহান্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার অধ্যাপক ডাঃ আর্থার ব্রিক্সেলে জোয়কে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। জোয়ের

পিতা এডওয়ার্ড মাইকেল (৪৪ বৎসর) কন্যার এই আজগুবি গল্পগুলি এক সময়ে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু এখন খুব মন দিয়ে শোনেন। তার মা ক্যারলিন ফ্রান্সিস এলিজাবেথ ভারতয়ে অফিসের সেক্রেটারীর কাজ করেন। সম্প্রতি জোয়ে যা কিছু বলে তিনি তা ডায়রীতে লিখে রাখেন।

তাঁরা জানালেন—জোয়ের যখন মাত্র দু'তিন বছর বয়েস হবে তখন থেকে সে এই সব বিচিত্র ঘটনাবলী বলতে সুরু করে। কথা বলা ও লিখতে পারার আগেই সে ঐতিহাসিক দৃশ্য, নক্সা বা বহু কালের পুরানো ব্যবহৃত জিনিসের ছবি আঁকতো।

'বাড়ীর থেকেও বড় জন্তুর' (ডাইনোসেরাস) তাড়া করার প্রসঙ্গে জোয়ে বলে—"আমি আমাদের গুহায় ছুটে পালিয়ে আসি। আমাদের গুহায় ঢোকবার পথ মাত্র একটাই হত। বেশি পথ থাকলে বিপদ ছিল। কারণ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি নিশাচর জন্তুরা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ত। যেদিন তারা ঢোকবার সুযোগ পেত সেদিন সকালে আমরা গুহার চারিদিকে রক্তের দাগ দেখতে পেতাম। আমরা বুঝতে পারতাম আমাদের মধ্যে কাউকে জানোয়ার ধরে নিয়ে গেছে।"

জোয় যখন খুব ছোট তখন একদিন একটা পাল তোলা জাহাজের ছবি এঁকে জানায়—"আমাকে এই জাহাজে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি প্রাসাদে অনেক দিন বন্দী ছিলাম আমি। আমরা ক্রীতদাসীরা কোন কথা বলতে পারতাম না। কথা বললে আমাদের জিব কেটে নেওয়া হত।

"প্রাসাদের মধ্যে আমরা সূর্য দেবতার জন্য পূজা ও প্রার্থনা করতাম। 'বালা' নামে এক বিরাট মূর্তির সামনে চীৎকার করে আমরা বৃত্তাকারে নাচতাম। আমাদের রাজা ভয়ানক দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল। তার এক রাণীর খুব সুন্দর লম্বা ঘন চুল ছিল। একদিন কি কারণে রাজা রাণীর ওপর রেগে যায় এবং তার মুণ্ডপাতের আদেশ দেয়। একজন জোয়ান ক্রীতদাস রাণীর মাথাটি কেটে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আতর মাখিয়ে নিয়ে

আসে। রাণীর সেই সুন্দর চুলগুলি মাথার চার পাশে জড়িয়ে রাখা ছিল।

"একদিন রাজা আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। আমি যেতে রাজী হই না। একজন ক্রীতদাস একটা ঘেরা বাগান মত জায়গায় আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অন্য একজন জল্লাদের মত লোক একটা তীক্ষ্ণ তলোয়ার দিয়ে আমার মাথা কেটে ফেলে।"

জোয়ে তার গল্পে ঘটনার ভৌগোলিক স্থানের নামগুলি উল্লেখ করতে পারেনি। কিন্তু তার বর্ণনা থেকে স্থানটিকে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যেমন তার উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির উপর যাওয়া ও পিরামিডের কথা থেকে বুঝতে পারা যায় সে মিশরের কথা বলছে। রোমদেশে তার পূর্বজন্মের কথা বলবার সময় সে জানায়, সে দেশের লোকেরা কাঠের জুতো পরতো; যুদ্ধের চামড়ার পোষাকে পেতল ও সোনার কাজ করা থাকতো।—"আমি যখন রোমে ছিলাম তখন আমার বয়স খুবই কম। আমরা পনেরো জন মেয়ে একসঙ্গে সিল্কের সূতো দিয়ে নানা রঙের চাদর তৈরী করতাম।"

মাটির তলা থেকে ডিম খুঁড়ে বের করার গল্পটি সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তমাশা অন্তরীপের বুশম্যান সম্প্রদায়ের কথা মনে করায়। উত্তমাশা অন্তরীপকে তখন পর্তুগালরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াতের রাস্তায় রসদ আদান-প্রদানের বন্দর হিসাবে ব্যবহার করতো। জোয় জানায়—"বুশম্যানরা মাটির নীচে যেখানে বড় ডিম রাখতো তার উপরে একটা কাঠি নির্দেশ হিসেবে পুঁতে দিতো। আমরা ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই কাঠিগুলো তুলে ফেলে তার উপরে জন্তু-জানোয়ারের রক্তের দাগের নিশানা মুছে ফেলে মজা করতাম।"

জোয়ের সবচেয়ে চমকপ্রদ কাহিনী হল উনবিংশ শতাব্দীর প্রেসিডেন্ট 'ওমপলের' সঙ্গে পরিচয়ের কথা। প্রেসিডেন্টের সেই বাড়ীটি (Kruger House) এখন সরকারী মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে।

জোয় জানিয়েছিল যে, মিউজিয়াম হবার আগে ঐ বাড়ীতে সে বহুবার গেছে এবং ১৯০৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে পরিচয় ছিল। সে জানায় যে, প্রেসিডেন্টের প্রথম পত্নী মারিয়া ডুপ্লেসিস ষোল বছর বয়সে প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। প্রেসিডেন্ট এর পর প্রথমা পত্নীর ভাইঝিকে বিবাহ করেন। এবং তাঁর ষোলটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় খবরগুলি সত্য। জোয়ের স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, এসব কাহিনী তাঁর নিজের অজ্ঞাত এবং ক্লাশে এ-ধরণের কোন সংবাদ কখনো পরিবেশন করেন নি।

অধ্যক্ষ ডাঃ ব্লেক্সলের মতে—"আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। অল্পখ্যাত ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিষয়ের বর্ণনা আমি অবাক হয়ে বালিকাটির কাছে শুনেছি। সে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিষয়গুলি বলে যে, ব্যক্তিগতভাবে সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে এভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব।"

তার মত মেয়ে প্রশ্নকারীর মানসচিন্তা (Telepathy) পাঠ করতে পারে। এ বিষয়ে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন না করেই জোয় যে সব কাহিনী বর্ণনা করেছে, সে প্রসঙ্গে এ ব্যাখ্যাটি খাটবে না।

'অশরীরী আত্মা' বাস্তবিক পক্ষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে একথা বিজ্ঞানসম্মত ও গ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করা টেলীপ্যাথির অস্তিত্ব (যদি-ও তা সম্ভব) প্রমাণের থেকে অনেক বেশি কঠিন। ডাঃ ব্লেক্সলে বালিকাটিকে পরীক্ষার পর এই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এ থেকে এ-ও প্রমাণ করা যায় না যে, বালিকাটির ক্ষেত্রে আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার তেরো বছর বয়সের এই বালিকার নয়টি অতীত জীবনের ঘটনা থেকে আমরা প্রবন্ধের প্রশ্নটির সম্মতিসূচক জবাব দিতে পারি।

মৃত্যুতে মস্তিষ্কের বিনাশ হবার পর স্মৃতি কী করে বেঁচে থাকে?

এ প্রশ্নের জবাব খোঁজ করার আগে আর একটি প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। আমরা কি আজও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি যে মন মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত বলে সর্বদাই মস্তিষ্কের উপরে নির্ভরশীল? অপর ব্যক্তির চিন্তাপঠন বা দূরবর্তী ঘটনার তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন প্রভৃতি মনের এই ক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় এবং সময়, গতি, ও পদার্থের চিরন্তন নিয়মের পরিচালনাধীন হয়। যদি সামান্য কিছু কালের জন্যও মানসিক অবস্থা জাগতিক নিয়মের বাইরে কার্যক্ষম থাকতে পারে তাহলে পূর্বজন্মের স্মৃতিও কোন না কোন উপায়ে বেঁচে থাকতে পারে। বিষয়টি বা অবস্থাটি আশ্চর্যজনক সত্য, এটা না থাকলে উপায় নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

Clairvoyance-এর একটি দৃষ্টান্ত

জুন মাসের সকালে লণ্ডনের এক শনিবার। ছুটির আনন্দে মত্ত লোকের ভিড়ে মিস জিনা বিউচাম্প ও তার মা-ও রয়েছে। জিনার বয়স ২৩, সে অফিসে সেক্রেটারীর কাজ করে। মান্‌সটন বিমান বন্দরে যাবার জন্য তারা গাড়ীর অপেক্ষায় ভিক্টোরিয়া কোচ ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিনা মাকে জানাল—"আমাদের আজ কিন্তু যাওয়া উচিৎ নয়। আমার মনে হচ্ছে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।"

অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সে কিছুতেই যেতে রাজী হয়না। অগত্যা মা একা গেলেন এবং জিনা বাড়ী ফিরে আসে। কয়েক ঘণ্টা বাদে খবর এল দক্ষিণ ফ্রান্সের পারাপগনান শহরের কাছে বিমান দুর্ঘটনায় শ্রীমতী বিউচাম্প ও অন্য ৮২ জন সহযাত্রীর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

এটাকে কি কাকতালীয় বলা চলে? না কি নিছক কোন দৈবপাকে জিনা শেষ মুহূর্তে যাবার সিদ্ধান্ত নাকচ করে? অথবা

সে এই আসন্ন দুর্ঘটনাটি দেখতে পেয়েছিল ? অন্য হাজার হাজার সমগোত্রীয় ঘটনার সঙ্গে মিস বিউচাম্পের এই ঘটনার তুলনা করলে বলা চলে বিষয়টি সাধারণ বিচার বুদ্ধির অগম্য। এবং সময় ও কালের পরিধির বাইরে মনের কার্যকারিতাকে স্বীকার না করলে ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা চলে না।

আমরা যদি পুনর্জন্মের ঘটনাগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা সংঘটিত (Extra Sensery Perception) ভাবি তাহলে বিষয়টিকে অবাস্তব মনে হয় না। জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসীরা ধারণা করে থাকেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জাগতিক বিষয়বস্তু কাল গতি ও পদার্থের স্থুল নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত এবং সেখানে অশরীরী কিছু বিদ্যমান থাকতে পারে না। কিন্তু মানব মনের এই অশরীরী চরিত্রগুণে পুনর্জন্মের ভিত্তিমূল স্থাপিত ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো জড়বাদী নিয়মের বাইরে স্বয়ংক্রিয় এবং সে কারণেই পুনর্জন্মের বিষয়টি শরীর বিদ্যার প্রচলিত নিয়মের ব্যাখ্যাধীন নয়। অতএব পুনর্জন্মে অতীতের স্মৃতি স্মরণ করা যে সম্ভব এটা মেনে নেওয়াই ভাল।

ইংলণ্ডের আর একটি কাহিনী

"আমরা নরদান্টে থাকতাম। আমার এগারো বছর বয়সের সময়ে বড়দিনের ছুটি কাটাতে আমি ওয়ে মাউথে এক আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছিলাম। ইয়োভিল ষ্টেশনে আমাদের ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। জায়গাটি বিশেষ করে ষ্টেশনের পাশে। এই পাহাড়ী অঞ্চলটি আমার পরিচিত বলে মনে হয়। আমি আমার ভাইকে বললাম—আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন এখানে আমরা থাকতাম। মনে আছে একবার অন্য দুজন বড় মেয়ের হাত ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে পাহাড় থেকে নামবার সময়ে সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। আমার পায়ে ভীষণ চোট লাগে।

"মিথ্যে কথা বলছি ভেবে আমার মা আমাকে ধমক লাগালেন।

কারণ আমরা কখনও সে অঞ্চলে আসিনি, থাকার প্রশ্ন তো ওঠেই না। আমি কিন্তু বার বার জানালাম, কথাটা সত্য। আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম—যেদিন পাহাড়ের উপর পড়ে যাই সে দিন আমি গোড়ালি অবধি ঢাকা একটা সাদা ফ্রক পরেছিলাম তাতে সবুজ পাতা-কাটা কাজ করা ছিল। আমার তখন নাম ছিল মার্গারেট।— এবারে মায়ের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। তিনি পথে আর আমাকে কথা বলতে দিলেন না। পরে আমি জানতে পারি, আমি জীবনে কখনও সেখানে আগে যাইনি। কিন্তু তবু সেখানকার ঘটনাগুলো আমার নিজের বর্তমান জীবনের ছোটবেলার ঘটনার স্মৃতির মতই উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল।

"এঘটনার প্রায় সতেরো বছর পরে আমি এর অর্থ খুঁজে পেলাম। আমি তখন মেট্রোরে আমার অফিসের 'বসের' সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ডরসেটের কাছে আমাদের গাড়ীর টায়ার বদলানোর প্রয়োজন হওয়াতে আমরা সময় কাটানোর জন্য অল্প দূরে একটা কুটিরে বসতে যাই। অল্পবয়সী এক ভদ্রমহিলা আমাদের চা এনে দিলেন।

"ঘরের দেওয়ালে একটা পুরোনো ছবির দিকে আমার চোখ পড়ে। আশ্চর্য হয়ে দেখি সেটা আমার ছেলেবেলার ছবি। আমি ভীষণ অবাক হয়ে চীৎকার করে বলেই ফেললাম, কী আশ্চর্য, আমার ছবি এখানে কি করে এল? সেই মহিলাটি ও আমার অফিসের বড় সাহেব হেসে উঠলেন।

'ভদ্রমহিলা জানালেন, 'বাচ্চাটি অনেকদিন হল মারা গেছে। তবে তুমি হয়তো ওর মতই দেখতে ছিলে ছেলেবেলায়। বড় সাহেবও সে কথায় মাথা নাড়লেন।

"আমি মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা তাঁর বৃদ্ধা মাকে ডেকে আনলেন। তিনি গল্প করলেন যে, বাচ্চাটির নাম ছিল মার্গারেট কেম্পথোন এবং এক বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবারে পরিচারিকার কাজ করতো। তিনি তাঁর মায়ের মুখে শোনা কাহিনীটি আমাদের শোনালেন—

"মাগারেটের যখন পাঁচ বছর বয়স সে একদিন দুটি বয়স্ক মেয়ের সঙ্গে টিলার উপরে ছুটোছুটি করে খেলছিল। তাদের একজনের পা খরগোশের গর্তে পড়ে যাওয়াতে সকলেই এক সঙ্গে পড়ে যায়। বাচ্চা মেয়েটি সবার নীচে চাপা পড়ে এবং তার পা ভীষণভাবে জখম হয়। সেই ভাঙ্গা পা আর ভাল হয়নি। দুমাস অসুস্থ থাকার পর মেয়েটি মারা যায়। তার বাঁচবার ভীষণ ইচ্ছে ছিল। সে নাকি মারা যাবার আগে বলেছিল—মা আমি কিছুতেই মরবো না।'

"বৃদ্ধা জানালেন, 'সেই ফার্মটি এখন কোথায় তা তিনি জানেন না, তবে কাছাকাছি শহরের নাম ছিল ইযোভিল। আমি ঘটনাটি কোন্ সময়ের জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা ফটোটি নামিয়ে আনলেন। ফটোর পেছনে একটা কাগজের স্লিপে লেখা ছিল—মার্গারেট কেম্পথ্রোন। জন্ম : ১৫শে জানুয়ারী ১৮৩০, মৃত্যু : ১১ই অক্টোবর ১৮৫৫ খৃঃ।

"মার্গারেটের মৃত্যুর দিনেই ইয়োভিল থেকে বহু দূরে নরদাণ্টে আমার ঠাকুমা জন্মগ্রহণ করেন। আর আমার নিজের জন্মদিন ২৫শে জানুয়ারী।"

কানাডার একটি কাহিনী :

কানাডা দেশের এক ভদ্রমহিলার পূর্ব জীবনের ঘটনাটি খুবই বিচিত্র এবং বিস্ময়কর।

"আমি আমার স্বামীর সঙ্গে মোটরে অণ্টারিও (কানাডা) প্রদেশে যাচ্ছিলাম। স্মিথ জলপ্রপাতের কাছাকাছি আসার পর আমি সামনের শহরের বর্ণনা করতে লাগলাম। আমার স্বামী জানতেন আমি আগে কখনো এখানে আসিনি। আমার মুখে রাস্তা ঘাটের বর্ণনা শুনে তিনি অবাক।

"আমি জানিয়েছিলাম যে, শহরের প্রধান রাস্তার প্রথম মোড়ের মাথার এককোণে ডেসজারডিংসের মুদির দোকান এবং তার

উল্টোদিকের ফুটপাতে রয়েল ব্যাঙ্ক অফ কানাডার শাখা অফিস আছে।

"শহরে পৌঁছে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম মোড়ের মাথায় ব্যাঙ্কের অফিস আছে এবং অন্যদিকে মুদির দোকানও রয়েছে। কিন্তু দোকানের নাম আলাদা। আমার স্বামী গাড়ী থামিয়ে দোকানে খোঁজ নিলেন, জানা গেল ত্রিশ বছর আগে দোকানের মালিকের নাম ছিল ডেসজার ডিংস।'

"আর একবার ছেলেবেলায় আমরা ইতালীতে প্রথম বেড়াতে যাচ্ছিলাম। ট্রেণ কিছুক্ষণ চলবার পর আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বারবার কামরার বাইরে ও ভেতরে যাতায়াতে অন্য সকলে বিরক্ত হলেন। আমি বেশিরভা। সময়ই বাইরের দিকের করিডোরে বসে কাটালাম। হঠাৎ আমি খুব শান্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। এবং তারপরই আমি অনুভব করবাম ট্রেন যে অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে তার সব কিছুই আমার জানা—এর পরে কোন জায়গা আসবে ও সেখানে কী দেখতে পাবো সবই আমি আগে থেকে মনে করতে পারছি।

"ট্রেণ এখন আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামছে। নীচের দিকে ঐ কোণে একটা গীর্জা থাকবে ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে। চারপাশ একেবারে ফাঁকা, ধারে কাছে কোনো গ্রাম নেই। গীর্জাটা যেন ঠিক প্রহরীর মত ······· ওমা, ঐ তো গীর্জাটি এসে গেল।

"আমি ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা এবার একটু পরে বাঁদিকে একটা ঝর্ণা থাকবে, তার দু'পাশে বড় বড় লম্বা লম্বা গাছ এবং আর একটু পরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রূপালী পাতাওলা গাছের ঝোপ থাকবে। আচ্ছা পাতাগুলো অমন রূপালী কেন? একথা আমি আগে খুব ভাবতাম। তখন আমি জলপাই গাছ কখনো দেখিনি তাই জানতাম না তাদের পাতা ঐ রকম রূপালী হয়। আমাদের ট্রেনটা সেখানে আসতে অন্য একজন এবারে আমাকে সে-কথা বলে রূপালী গাছগুলো চিনিয়ে দিল।

সেবারের মত এমন করে কখনও আমার মনে হয়নি জায়গাটা আমি চিনি ও জানি। অবশ্য এও জানতাম এখানে আগে আমি কখনো আসিনি।

'পরে আমি যখন আমার ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে ইতালীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একজন শ্রমিক শ্রেণীর লোক আমাদের অভ্যর্থনা করলো ইতালীতে। আমি ফরাসীতে উত্তর দিযে জানালাম ইতালী ভাষা আমি জানি না। শ্রমিকটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। ভাঙ্গা ফরাসীতে বললো, কিন্তু তুমি তো একেবারে ইতালীর মেয়েদের মত দেখতে। আমার স্থির বিশ্বাস তুমি আমার দেশের-ই কোন অঞ্চলের মেয়ে।

"আমি তখন সেই আগের ভ্রমণের কথা ভাবছিলাম। ইতালীর অনেক কিছু আগেই জেনে ফেলার কথাও মনে পড়ল। এখন এই শ্রমিকটি আবার জোর গলায় বলছে আমি তার দেশের মেয়ে। তবে কি আমি এদেশের কোন চাষী রমণী ছিলাম? এই পাহাড়ে পাহাড়ে এই চার্চে, সাইপ্রাস ও অলিভ গাছের জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম আগে? সে কথা আমি অবাক হয়ে আজও ভাবি।"

অতি সম্প্রতি অষ্ট্রেলিযাতে একটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। খবরের বর্ণনা মত মিঃ আর্ণেষ্ট ব্রিগস মিশরে তাঁর বিগত জীবনের কথা হুবহু বলে যেতে পারেন। অষ্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে না।

উপরের এই সব ঘটনা থেকে আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর যথাযথ পাওয়া যেতে পারে। যদি Telepathy, Clairvoyance জাতীয় অশারীরিক বিষয়গুলি ঘটতে পারে, তাহলে পূর্ববর্তী জীবনের স্মৃতিশক্তি অবিনষ্ট অবস্থায় থাকতে পারে।

পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা জন্মান্তর ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে কা?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুভাবী পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা বলতে

পারলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটা প্রকৃত জন্মান্তরের ঘটনা নয়। কোন কোন অবস্থায় এ ধরণের অভিজ্ঞতা হতে পারে। সেগুলি নীচে উদাহরণ সহ বিবৃত করা হল :

বিভ্রান্তি (FRAUD)

কোন কোন ঘটনা এই ধরনের বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আগ্রার কাছে খুরানপুর গ্রামে স্কুলের ছেলে শিশুপাল দাবী জানাল যে, সে পূর্বজীবনে মহাত্মা গান্ধী রূপে জন্ম নিয়ে ছিল। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে সে অনেকগুলি চিঠি লেখে। তাতে সে জানায় যে,—এক অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক জীবন যাপন করছে।

অসুস্থ অবস্থায় শিশুপাল প্রথম এই পুনর্জন্মের কাহিনী প্রচার করে থাকে। তার অশিক্ষিত অভিভাবকেরা এ-কথা বিশ্বাস করে এবং তা থেকে গ্রামের অন্য অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকেরাও কথাটা সত্য বলে মেনে নেয়। ক্রমশ জনশ্রুতিতে বিষযটা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পডলে ঘটনাটি অনুসন্ধান করে দেখা হয়। কেসটি মিথ্যা সাজানো ঘটনা বলে প্রমাণিত হল। দেখা গেল ছেলেটি মহাত্মা গান্ধীর হত্যার আগেই জন্মগ্রহণ করেছে। আসলে সে স্কুলের লাইব্রেরী থেকে একটি গান্ধী জীবনীর বই জোগাড় করে গোপনে পড়াশোনা করে গল্পটি রটিয়ে দেয়।

আত্মার অধীনে (Spirit Possession)

পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের এটিও একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা অস্থায়ীভাবে কোন জীবিত ব্যক্তির, চিন্তা ধারণা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

লেবিন কাকিন নামে তুরস্কের জনৈক অল্প বয়স্কা ভদ্রমহিলা সন্ধ্যায় তাঁর শয়ন ঘরে ঢুকলেই দিব্য অনুভূতিতে এক আশ্চর্য দৃশ্য

দেখতে পেতেন ঃ একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেখানে একটি লোক নিজের পরিচয় 'জামাডাডোয়া' এই ধরণের কিছু একটা বলে দুর্বোধ্য ভাষায় যেন ভদ্রমহিলাকে কিছু বলে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা কিছু বুঝতে না পেরেও সেই একই কথা পুনরুচ্চারণ করতেন। লোকটি তার মুখ সর্বদা ঢেকে রাখতো—তবুও তাদের মধ্যে ক্রমশঃ পরিচয় গভীর হল এবং ভদ্রমহিলা স্বপ্নেই সেই ভদ্রলোকের প্রেমে পড়লেন।

প্রায় ২।৩ মাস এক নাগাড়ে এ ঘটনা ঘটে। তারপর হঠাৎ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক বছর বাদে আবার লোকটি স্বপ্নে দেখা দেয়। ভদ্রমহিলার মনে হল তিনি কোন সমুদ্রের ধারে লোকটির সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি তাঁর ভাষা আবার শিখতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে যে সব কথা হত তিনি তা লিখে রাখার চেষ্টা করতেন; কিন্তু জাগরিত অবস্থায় সে ভাষার বিন্দুমাত্র কিছু বুঝতে পারতেন না। ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করতেন যে তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে কখনও এই ভাষার সংস্পর্শে এ জীবনে আসেন নি তখন এটা নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ব-জীবনের কোন ব্যাপার হবে। বিগত জীবনের স্মৃতি হয়তো এভাবেই মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

কিন্তু এটিকে জন্মান্তরবাদের ব্যাপার না বলে কোন অতৃপ্ত আত্মার প্রভাবাধীন বলা অনেক বেশি সংগত।

স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শন (Clairvoyance)

পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের এটিও একটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

শারীরিক অনুভূতি গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় ও কল্পনায় বাস্তব পথ ছাড়াই স্বাভাবিক অনুভব ক্ষমতার বাইরে কিছু প্রত্যক্ষ করার নাম স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শন। C।airv. yaace-কে টেলিভিশন যন্ত্রের সঙ্গে অনেকে তুলনা করে থাকেন, একথা আমরা পূর্বে জানিয়েছি। অনুভাবী টেলিভিশনের মতই দূরবর্তী ঘটনা ও বিষয়বস্তুর ছবি নিজের চেতনায় দেখতে পান। এই দর্শন স্বপ্নের মাঝে কিংবা জাগরণে হতে পারে।

নীচে স্বপ্নের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হবার কিছু কাল আগেই নিজের মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছবি দেখেছিলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি এই ঘটনাটি বলেছিলেন এবং যে ভাবে এই কাহিনীটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে তাতে ব্যাপারটা আজগুবি বা গল্প কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হোয়াইট হাউসে এক বিশেষ জমায়েতে তিনি ঘটনাটি বলেছিলেন। লি'র আত্মসমর্পণের সংবাদে প্রেসিডেন্টের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দ করছিলেন। কিন্তু লিঙ্কন অস্বাভাবিক বিমর্ষভাবে বসে ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় ও শ্রীমতী লিঙ্কনের পীড়াপীড়িতে তিনি স্বপ্নের কথা জানান। কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের মার্শাল ওয়ার্ড হিল ল্যামন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। হুবহু সেই রিপোর্টের অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।

"প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন বলতে শুরু করলেন—দিন দশেক আগে বেশ রাত হয়ে যেত শুতে। সে দিন আমি কতকগুলো জরুরী ডাকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ...। শোবার অল্পপরেই আমি স্বপ্ন দেখতে থাকি। আমার চারপাশে মৃত্যুর স্তব্ধতা যেন ঘিরে রয়েছে। এমন সময় আমি চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হল যেন কোথাও অনেক নরনারী মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছে। স্বপ্নেই আমি বিছানা থেকে উঠে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সেখানের স্তব্ধতা রুদ্ধ কান্নার শব্দে ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু আমি শোকার্তদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

"আমি ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম কিন্তু কাউকেই কোথাও দেখতে পেলাম না। আমার চারিদিকে কান্নার শব্দ কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন চলতে লাগল। সমস্ত ঘরেই আলো জ্বলছিল, চারিদিকের সব কিছুই আমার বিশেষ পরিচিত, তবে কান্না এমন হৃদয় বিদারক কিছু ঘটার জন্যে কাঁদছে?

"আমি কিছুটা আতঙ্কিত ও আশ্চর্যান্বিত হলাম। এসবের মানে কি হতে পারে? শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখার জন্য চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে আমি পূর্ব দিকের অংশে এলাম। সেখানে আমার জন্য এক চরম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দেখি শবযাত্রার গাড়ীতে একটি মৃত দেহ ঢাকা দেওয়া রয়েছে কবরে যাবার অপেক্ষায়। গাড়ীর চারপাশে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। সেখানে বহু লোক জমা হয়েছে। তাদের সকলেই মৃতের দিকে চেয়ে আকুল ভাবে কাঁদছে। – হোয়াইট হাউসে এখন কে মারা গেল? আমি একজন সৈনিকের কাছে জানতে চাইলাম।'

"উত্তর এল – আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট। তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।"

জন্মান্তরের প্রকৃত স্মৃতি না নিয়ে জন্মালেও অনেকে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ক্ষমতা দ্বারা অন্য ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করে পুনর্জন্মের দাবী জানাতে পারে কিন্তু বিশেষ সন্দেহ-বাতিকেরা বিষয়-গুলি যথাযথ বিচারের ধৈর্যের অভাবে পুনর্জন্মের সব ঘটনাকেই 'বিভ্রান্তিকর' বলবেন হয়তো। অবশ্য তা যুক্তিযুক্ত হবে না। বহু প্রমাণের পর আত্মার জন্মান্তর এখন স্বীকৃত সত্য। এমন অনেক ঘটনা রেকর্ডে আছে যেখানে অনুভাবী বিগত জীবনের পরিচিত বন্ধু বান্ধব-দের (যারা এখন মৃত) জীবনের ঘটনাও উল্লেখ করেছে। ব্যক্তিগত-ভাবে আলাপ পরিচয় না থাকলে স্বাভাবিকভাবে সে সব খবর কারোর জানা হয়তো সম্ভব নয়।

স্মৃতিকথা বা স্মরণ ছাড়াও তারা বিগত জীবনের সঙ্গে যুক্ত জায়গা ও জিনিসপত্র সনাক্ত করেছেন এবং তাঁদের বর্তমান জীবনে অতীত জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা গেছে।

আত্মার অধীনে বা নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকার কারণ দিয়েও পুনর্জন্মের সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা চলবে না। দেখা গেছে যে 'আত্মার অধীনস্থ ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বা আংশিক হারিয়ে ফেলে এবং একটি 'মিডিয়ামে' পরিণত হয়। 'মিডিয়াম' আত্মার সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং অস্বাভাবিক আচার-আচরণ করতে থাকে। প্রকৃত পুনর্জন্মের অনুভাবীরা সে ধরণের দৈবাৎ আচরণ করে না এবং অন্য সকল সাধারণ মানুষের মত নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

অতি-মনের অধিকারীরা, যারা টেলীপ্যাথি ও ক্লেয়ারভয়েন্সের বিভিন্ন ক্ষমতার দাবীদার তাদের প্রসঙ্গে এখন বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে।

ক্লেয়ারভয়েন্সের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের উদারহণটি দেওয়া হয়েছে। একদল মতবাদীরা বলে থাকেন টেলীপ্যাথি ও ক্লেয়ারভয়েন্সের সাহায্যে মৃত ব্যক্তির জীবনের কিছু কিছু ঘটনা জেনে নিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য পুনর্জন্মের ব্যাপার বলে ঘটনা চালাতে চেষ্টা করে। এ যুক্তির ভিত্ত কিছুটা দুর্বল। অতীত জীবনের স্মৃতির অনুভাবীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা Telepathy বা Clairvoyance শক্তির অধিকারী নয়। এই শক্তিগুলির বাড়তি অধিকারী হলেও তারা কিছুতেই অতীত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেদের ও বিভিন্ন জিনিষকে সনাক্ত করতে পারতো না এবং পূর্বজীবনের পরিচিতদের দেখে অমন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ভাবাবেগে উদ্বেলিত হতেও পারতো না। এখানে থাইল্যাণ্ডের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

আমার মৃতদেহ এখানে শায়িত ছিল

প্রাজ্ঞদর্শন শীর্ণকায় বৌদ্ধ সাধু থাইল্যাণ্ডের নাকন সাওন গ্রামের এক সাধারণ কুটিরের বারান্দার এককোণে আঙুল তুলে নির্দেশ দিলেন। তারপর খুবই স্বাভাবিক গলায় তিনি বর্ণনা করলেন যে, সেদিন থেকে প্রায় উনপঞ্চাশ বছর আগে তাঁর মৃত্যুর পর শোকার্তরা কি ভাবে মৃত দেহটি বারান্দার ঐখানে রাখে, কি ভাবে দেহের সৎকার করে এবং তিনি তাঁর নিজের ছোট বোনের ছেলে হয়ে কেমন করে পুনর্জন্ম নিয়েছেন—এ সবই তিনি নাকি নিজের চোখে দেখেছেন।

সন্ন্যাসীর নাম ফ্রা রাজাসুস্থাজারাণ। তিনি থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্মানিত সদস্য—এবং ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁর পুনর্জন্মের কাহিনী জানে। পরিবারের অন্য লোকেরাও সমস্ত কাহিনীটিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি শিশু বয়সে যখন প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেন সেদিন থেকেই বর্তমান মাকে 'ভগিনী', বলেন এবং পরিবারের অন্য সকলকে গত জন্মের সম্পর্ক-সূত্রে সম্বোধন করতেন। অতীত জীবন সম্পর্কে যে সব গোপনীয় কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তা বর্তমান জীবনে কোন প্রকারেই জানতে পারার কথা ছিল না।

আশা করা যায় এসব উদাহরণ থেকে প্রশ্নটির সঠিক উত্তর পাঠকরা নিজেরাই দিতে পারবেন অথবা পুনর্জন্মের সঠিক ব্যাখ্যার পক্ষে নিজেদের মতামত নিজেরাই ব্যক্ত করতে পারবেন।

জন্মান্তরের ঘটনাগুলিকে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়?

জন্মান্তরের ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করতে গবেষককে যুগপৎ ঐতিহাসিক, আইনজ্ঞ ও মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। পূর্বের অর্জিত জ্ঞানের উপরেই স্মৃতিশক্তি নির্ভরশীল—এটা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। পূর্বজন্মের স্মৃতি কথা বলার ক্ষেত্রে এই আগে থেকে জানা-শোনার ব্যাপারটি থাকে না। বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করার জন্য জনৈক ইংরাজ সৈনিকের কাহিনীটি বর্ণনা করা হল। গল্পটি তার জবানীতেই ব্যক্ত করা হল:

"আমি একজন সাধারণ সৈনিক। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অল্প কালের মধ্যেই আমাদের পূর্বাঞ্চলে পাঠান হয়। আমি আগে কখনো ভ্রমণে বের হই নি বা বিদেশে যাই নি। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর আমাদের এমন স্থানে যাবার আদেশ দেওয়া হল যে সেখানে আগে কখনও কোন ইংরাজ দল যায়নি। কোন্ পথে রওনা হবেন ভেবে আমাদের অফিসারেরা আমাদের দলের চিন্তায় পড়লেন। কেউই জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু জানতো না এবং সে স্থানের কোন মানচিত্রও আমাদের কাছে ছিল না।

"কিসের জন্য জানি না আমি সোজা অফিসারদের কাছে গিয়ে জানালাম —সুযোগ দিলে আমি আমাদের দলকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে পারবো। কারণ এ জায়গাটা আমার বিশেষ জানা। সকলেই আমার একথায় যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করলেন। প্রমাণ দেবার জন্য আমি জানালাম যে, সামনের ঐ পাহাড়ের ওদিকে পাথরের তৈরী একটা পরিত্যক্ত বাড়ী আছে। যাচাই করার জন্য সেখানে গিয়ে সকলে এবং আমিও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার কথাই ঠিক। এরপর আমাকে পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং পথ সম্পর্কে আমার প্রতিটি আগাম সংবাদ সত্য প্রমাণিত হতে থাকে। ব্যাপারটাতে আমি নিজেই ভীষণভাবে বিস্মিত হয়ে পড়ি।"

এই সৈনিকটি যেখানে তার দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সেখানে আগে সে কখনও যায় নি। অন্য সৈন্যরা ও তাদের অফিসারেরা মেনে নিয়েছিলেন যে সৈন্যটি পূর্ব-জীবনে এ অঞ্চলে বসবাস করেছে। সেই অতীত জীবনের স্মৃতি আজ হঠাৎ জাগরিত।

এ ধরণের একটি ঘটনা গবেষণা করার সময় পরীক্ষককে যত বেশি সম্ভব লোকের সাক্ষ্য নিতে হবে। পূর্ব-জীবনের স্মৃতির দাবীদার ব্যক্তির বর্তমান পরিবারবর্গের ও অতীতের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সকলের হাবভাব, আচার-আচারণ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সাধারণত দেখা যায় জন্মান্তরের স্মৃতির দাবীদাররা অল্প-বয়স্ক শিশু। আগের জীবনের ঘটনা ও ব্যক্তির প্রসঙ্গে কথা বলার সময় তারা বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। তারা যেরকম বিস্তারিত ভাবে সে সব কথা বলে থাকে সেগুলি বর্তমান জীবনে সাধারণভাবে তাদের পক্ষে অন্তুতঃ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ফ্রান্সের একটি ঘটনা

শ্রীমতী হেনরিয়েটা গে'র তিন মাসের শিশু কন্যা থেরেসা গে হঠাৎ কথা বলতে সুরু করে তার বাবা-মাকে চমকে দেয়। প্রথম

শব্দটি সে বলে "অরূপ"! শব্দটি তাঁরা বুঝতে না পেরে হাসাহাসি করতেন, পরে তাঁরা জানালেন 'অরূপ' একটি সংস্কৃত শব্দ। তিন বছর বয়সে সে কথাবার্তায় ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করতে থাকে অথচ তার মা ফরাসী শেখানোর বিশেষ চেষ্টা করতেন। তারও কিছুকাল পরে সে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে কথা বলতে থাকে। গান্ধীজীর কথা বলার সময় 'বাপু' শব্দটি ব্যবহার করত এবং তার বিবরণ থেকে বোঝা যায় গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের সময় সে তার বিশেষ পরিচিত ছিল।

মেয়েটির বাবা-মা হকচকিয়ে গেলেন। তাঁরা নিজেরাই গান্ধী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না। অথচ তাঁদের কন্যা কিভাবে বিস্তারিত বিবরণ দেয় গান্ধী জীবনের!

এই ধরণের ঘটনা পরীক্ষা করার সময় অনুসন্ধানকারীরা কাহিনী গুলি খবরের কাগজের মাধ্যমে বা বই পড়ে সংগ্রহ করার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দিতে পারেন না। যদিও বুঝতে পারা যায় শিশুটি সে সব পথে এই অতীত স্মৃতি অর্জন করে নি। অনুভাবী হয়তো কী ভাবে সংবাদগুলি সংগ্রহ করেছে তা ভুলে যেতে পারে এবং যথেষ্ট সততার সঙ্গে বিষয়গুলি বর্ণনা করে মৃত-আত্মার পুনর্জন্মের কথাই বিশ্বাস করাতে পারে। গবেষককে তাই বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রেখে কাজে এগোতে হয়।

যখন বিশ্লেষণ করে মোটামুটি ধারণা জন্মায় যে অনুভাবী বর্তমান জীবনে এ কাহিনী স্বাভাবিক পথে অর্জন করে নি তখন তাকে পূর্ব জীবনের ঘটনা স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে অনুভাবী যে জীবনের পুনর্জন্মের দাবী করছে তার সমসাময়িক অন্যান্য লোককে, জিনিসপত্র অথবা ঘটনা স্থলকে চিনতে পারে কিনা কিংবা অতীতের জায়গায় এসে অন্য আরো ঘটনা স্মরণ করতে পারে কিনা। এ ব্যাপারে আর একটা উদাহরণ দেওয়া চলে।

থাইল্যাণ্ডের একটি কাহিনী

থাইল্যাণ্ডের একটি শিয়ামিজ বালিকা তার পূর্ব-জীবনের চৈনিক

মাতা-পিতার কথা স্মরণ করতে পারতো। সে তার বিগত জীবনের মায়ের নাম জানায় এবং তার কাছে ফিরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। কাছাকাছি কোন চীনা পরিবার না থাকা সত্ত্বেও বালিকাটি বেশ কয়েকটি চীনা শব্দ বলতে পারতো এবং খাবার সময় হাত দিয়ে খাওয়ার চেয়ে চীনা প্রথায় কাটি দিয়ে খেতে পছন্দ করতো। তার বন্ধু-বান্ধবেরা জানিয়ে ছিল যে সে এখনো আগের মাকেই বেশি ভালবাসে।

লোক পরম্পরায় তার আগের মা এই কাহিনী শুনতে পান এবং তিনি প্রায় চৌদ্দ মাইল নদী পথ পেরিয়ে মেয়েটির গ্রামে আসেন। কিন্তু বাড়ী চিনতে না পারায় তাঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মেয়েটি সে সময় স্কুলে যাচ্ছিল—সে তৎক্ষণাৎ তাঁকে চিনতে পারে এবং 'মা' বলে জড়িয়ে ধরে।

এর পর তাকে আগের জন্মস্থানে নিয়ে আসা হয়। বালিকাটি নিজে এবং তাদের বর্তমান পরিবারের কেউ আগে সে শহরে কোনদিন আসেনি। বালিকাটি নির্ভুলভাবে পথ দেখিয়ে নিজেদের পুরোনো বাড়ীতে চলে আসে। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় তাকে লোক চেনার পরীক্ষা করা হল। মেয়েটির চীনা পিতা প্রায় পঞ্চাশ জন স্থানীয় অধিবাসী ও অন্য চীনাদের সঙ্গে পাবলিক নেশা ঘরে আফিং খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন এবং দরজার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে ছিলেন। মেয়েটিকে সেই ঘরে আনা হলে সে অত লোকের মধ্যে বিনা দ্বিধায় 'পিতাকে' সনাক্ত করে।

প্রথমে তার 'বাবা' বিশ্বাস না করলেও বিভিন্ন ঘটনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে মেনে নেন যে তাঁদের মৃত কন্যাই আবার জন্মগ্রহণ করেছে।

এর পরে স্তূপীকৃত অন্য অনেক জিনিষের মধ্যে সে তার নিজের জিনিষগুলো বার করে নেয় এবং অন্য যেগুলি তার মধ্যে ছিল না সে সবের কথা জিজ্ঞাসা করে। সুরু থেকেই সে সেই শহরের ও পরিবারের সব কিছুর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত তা নানাভাবে

প্রমাণ করে দেয়। মেয়েটি তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণের (মানব শিশু রূপে) মধ্যের সময়ের কথাও স্মরণ করতে পারতো। সেই সব কাহিনীর মধ্যে একটি প্রমাণ থেকে মেয়েটির জন্মান্তরের আর একটি সূত্র পাওয়া যায়। সে জানিয়েছিল যে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণের আগে তার সঙ্গে তার জীবিতকালের বন্ধুর আত্মাদের সঙ্গে দেখা হয়। তারা কিছু সময় এক সঙ্গে কাটায়। খবর নিয়ে দেখা যায় মেয়েটির এক অন্তরঙ্গ বন্ধুও একই দিনে মারা গিয়েছিল। দুজনেই শিশু বয়সে মহামারীতে প্রাণ হারিয়ে ছিল।

বিজ্ঞানের কোন্ শাখা জন্মান্তরবাদের বিষয়ে গবেষণা করে ?

ব্যবহারিক বিজ্ঞান পুনর্জন্মের সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর কোন আলোকপাত করতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বার বার এ ধরণের ঘটনার সংবাদ আসতে থাকায় পরামনোবিজ্ঞানীরা বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছেন। কিন্তু ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সাধারণতঃ বেশির ভাগ পরামনোবিজ্ঞানীই জন্মান্তরবাদের প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান না। তাঁরা নীচের মানসিক বৈশিষ্ট্য (সাইকীক ফেনোমেনা) নিয়ে গবেষণা করে থাকেন।

(ক) অন্য ব্যক্তির চিন্তা পাঠ করা (টেলীপ্যাথি)

(খ) তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শন (ক্লেয়ারভয়েন্স)

(গ) ভবিষ্যৎ বাণী (প্রেডিকসন)

প্রথম দুটির বিষয়ে উদাহরণ সহ বিশদ বর্ণনা আগে করা হয়েছে, এঅধ্যায়ে বর্তমানে তাই ভবিষ্যৎ বাণীর আলোচনা করা হল। পরের অধ্যায়ে *ESP*-র অন্য সব দিকগুলি নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছে।

অদূরে যে ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে চলেছে তা পূর্বাহ্নেই অনুধাবন করার ক্ষমতা অনেকের থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ডাঃ লাইবেণ্টের নোট বই থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনা তুলে দেওয়া হল। ঘটনাগুলি বিচিত্র ও চমকপ্রদ—

১৮৮৬ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক ডাঃ লাইবেল্টের কাছে পরামর্শের জন্য আসেন। প্যারিসে থাকার সময় ভদ্রলোক ১৮৭৯ খৃঃ ২৬শে ডিসেম্বর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগকারী এক 'মিডিয়ামের' সঙ্গে কৌতূহলবশে দেখা করেন। 'মিডিয়াম' ভদ্রমহিলাটি জানান—আগামী বছর এই দিনে আপনি আপনার পিতাকে হারাবেন। তার অল্প কিছুকাল পরেই আপনি সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবেন। খুব কম বয়সে আপনার বিবাহ হবে এবং দুটি ছেলে মেয়ের জন্মের পর মাত্র ২৬ বছর বয়সে আপনার নিজের মৃত্যু হবে।

মঁসিয়ের বয়স তখন উনিশ বছর। ১৮৮০ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর মঁসিয়ে তাঁর পিতাকে হারালেন। এরপর তিনি ন'মাসের জন্য ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন এবং তার খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয়। তারপর তিনি দুটি ছেলে মেয়ের জনক হন। তাঁর ২৬ বছর বয়স হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকী আছে। তিনি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে মারা যাবেন ভেবে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন।

ডাঃ লাইবেল্ট মঁসিয়েকে এই বিভীষিকাময় চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি অন্য আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মঁসিয়ের আলাপ করিয়ে দেন। এই ভদ্রলোক কিছুকাল আগে ডাঃ লাইবেল্টের বহুদিনের পুরোনো বাতের ব্যথা সেরে যাওয়ার এবং তাঁর কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। ভদ্রলোক যুবক মঁসিয়ের মনের জোর ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে উদ্দীপ্ত করতে থাকেন। মঁসিয়েকে দু'তিন দিন পরীক্ষা করার পর তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে ৪১ বছর বয়সের আগে তাঁর মৃত্যু হবে না।

এর ফল খুবই ভাল হয়েছিল। মঁসিয়ে ক্রমশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এবং তাঁর ২৬তম জন্মদিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কেটে যাওয়ার পর তিনি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে থাকেন। মানসিক চিকিৎসার দ্বারা এখানে যুবকটিকে তাঁর মৃত্যুভীতি থেকে মুক্তি দিয়ে মনের স্থৈর্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কার্যকরী হয়।

কিন্তু এর পরেও কাহিনীর একটি কথাই লেখা বাকী আছে। ১৮৮৬ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর সপ্তবিংশ বছর নির্বিঘ্নে কাটবার বেশ কিছু আগেই মঁসিয়ে হঠাৎ মারা যান। ডাঃ লাইবেল্টের বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও সেই 'মিডিয়াম' ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়।

প্রধানত এই ধরনের ঘটনাগুলি এবং মানব-মনের অন্যান্য বিচিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পরামনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল। সম্প্রতি পুনর্জন্মের ঘটনাতে পরাস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ থাকায় তা নিয়ে গবেষণা সুরু করা হয়েছে। এবং পরামনোবিজ্ঞানীরাই এই পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কোরিয়ার একটি কাহিনী

মধ্যে মধ্যে আমরা কাগজে দেখতে পাই তিন বছরের ছেলে নিপুণভাবে তবলা বা সেতার বাজাচ্ছে বা সেই ধরণের অন্য কিছু করছে। শিশুদের এই অসাধারণ প্রতিভার যে সব ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলি জন্মান্তরবাদ না মানলে এ-ধরণের শিশু প্রতিভার সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

কোরিয়ার শিউল শহরের ছেলে কিম ইয়ুং-এর ঘটনা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। ছেলেটি প্রচলিত প্রথায় পড়াশোনা না করেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। মাতৃভাষা কোরিয়া ছাড়াও ইংরাজী ও জার্মানীতে তার অগাধ জ্ঞান। ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের অত্যন্ত কঠিন সমস্যাগুলি বালক ইয়ুং অবলীলাক্রমে সমাধান করে দেয়। পরিণত বয়স্কদের মতই ছেলেটি অত্যন্ত সুন্দর কবিতা লেখে। সম্প্রতি সে আমেরিকার কলেজে ভর্তি হবার আবেদন পাঠিয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইয়ুয়ের জ্ঞানের চেয়ে বয়স নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন।

এ ধরণের ঘটনা একাধিক পাওয়া যায়। ওয়াশিংটনের সরকারী তহবিলখানার (ট্রেজারি) সেক্রেটারী আলেকজেণ্ডার হ্যামিলটন্ বারো বছর বয়সে কোন পড়াশোনা না করেই অনাবিল শুদ্ধ ফরাসীতে কথা বলতে পারতেন।

অতি সম্প্রতি এক রিপোর্টে জানতে পারা গেছে একজন আমেরিকাবাসী নির্ভুল সংস্কৃত বলতে পারেন, যদিও কোনদিন সংস্কৃতের চর্চা তিনি করেননি। তাঁদের বংশের কেউ এর ধারে কাছে যায় নি।

বিজ্ঞানীদের এযাবৎ আবিস্কৃত কার্যকারণ নির্ধারণের সজ্ঞায় সাধারণ ভাবে যেগুলির কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ সহজ কথায় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করাই পরামনোবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। তাই তাঁরা এই শিশু প্রতিভা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করছেন। কিন্তু নীচের উদাহরণে পুনর্জন্মের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে ইদানীং তাঁরা আগ্রহী বেশী।

থাইল্যাণ্ডের আর একটি ঘটনা

ঘটনাটি রাজকীয় থাই সৈন্য বাহিনীর এক সার্জেণ্ট সম্পর্কে। সার্জেণ্ট থিয়নের সারা বাঁকানের উপরের অংশের রগেতে জন্ম থেকেই এক বিকৃত ক্ষতের দাগ ছিল। সার্জেণ্ট দাবী করে যে সে পূর্ব-জীবনের স্মৃতি স্মরণ করতে পারে। গরু-মহিষ ইত্যাতি চুরি করার অপরাধে কয়েকজন গ্রামবাসী তাকে ছুরিকাঘাত করে। বর্তমানে সেখানে ক্ষত চিহ্ন, ছুরির আঘাত সেখানেই লাগে। মৃত্যুর পর বিদেহী অবস্থায় সে তার মৃতদেহ দেখেছিল। এর পরবর্তী জন্মগ্রহণের ও অত্যন্ত শিশুকালের সব ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারে।

পূর্বজন্মের মৃত্যুর সময় ডান পায়ের পাতায় তার এক গভীর ক্ষত এবং হাতে ও পায়ে উলকির দাগ ছিল। বর্তমান জীবনেও পায়ের পাতায় সেই ক্ষতের দাগ এবং জন্মের সময় হাতে পায়ে উলকির দাগের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সার্জেণ্টের কাহিনী তাদের গ্রাম প্রধান সৈন্যদলের অফিসারেরা এবং পরিবারের অন্য লোকে সমর্থন করেন।

সৈন্যবাহিনীতে সকলে সার্জেণ্টকে জমিদার বলে ডাকে। কারণ সে গত জীবনে, মিলিটারী ক্যাম্পের পাশে এক অংশের জমির মালিক ছিল এমন দাবী সার্জেণ্ট করে থাকে।

অনেক যুক্তিবাদী মানুষ বিষয়টিকে নিছক 'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দিতে চান। কি করে অনুভাবী তার বিগত জীবনের স্মৃতি স্মরণ করতে পারে এখনও তা পরামনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেন নি বলে তাদের গবেষণাকে সময় ও শক্তির অনাবশ্যক অপচয় বলে ঘোষণা করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য কিনা, এটা ভেবে দেখা দরকার।

বর্মার পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী উ নুর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা যায়, জন্মান্তরবাদ নিয়ে গবেষণা করার কোন প্রয়োজন ও মূল্য আছে কিনা।

বর্মা দেশের ঘটনাবলী

বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ-নু বৌদ্ধধর্ম মত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় জন্মান্তরের কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে মন্ত্রিসভার পতনে বিদায়ী বার্ত্তামন্ত্রী ডিবক উ-বা-চোর আত্মীয়ার কাহিনী তার মধ্যে একটি। সেই ভদ্রমহিলা যখন মারা যান সে সময়ে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে মহিলাটি তাঁর কোন এক আত্মীয়ার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। ভবিষ্যৎ বাণীতে আরো উল্লেখ ছিল যে তার পিতা সরকারী পদাধিকারী হবেন এবং কোন বুধবার ছেলেটি জন্ম গ্রহণ করবে।

ভদ্রমহিলার পরিবারের সকলে এই ভবিষ্যৎ বাণীকে বিশেষ আমল দেন নি। কারণ তাঁদের পরিবারের কেউই সরকারী অফিসারের সঙ্গে বিবাহিত নয়। কিন্তু মহিলার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁর নিজের মেয়ের সঙ্গে জনৈক সরকারী অফিসারের বিবাহ হয় এবং বুধবার তাঁদের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

শিশুটি যতই বড় হতে লাগল ততই দুরন্ত হতে উঠতে লাগল এবং নিজেদের পিতামাতার চেয়ে মৃত মহিলার অন্তরঙ্গ বন্ধু এক মামীর কাছে থাকতে বেশী ভালবাসতো। পরিবারের ও অন্য পাড়াপ্রতিবেশীদের গহনাপত্র একসঙ্গে রেখে পরে সেই বালককে দেখানো হলে সে বিনা দ্বিধায় পান্না বসানো একটি আংটি বেছে নেয়। এই আংটিটি মৃতা মহিলার বিশেষ প্রিয় ছিল।

উ-নু অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় উদাহরণ বর্মার প্রসিদ্ধ নর্তকী এক ব্যালেরিয়ানের। সে প্রধানমন্ত্রীকে এক সময় জানিয়েছিল যে আগের জীবনে সে একজন বিখ্যাত পুরুষ নর্তক ছিল। তখন তার নাম ছিল আউঙ্গবালা। প্রকৃতই বর্মাদেশে আউঙ্গবালা নামে এক নর্তক বর্তমান নর্তকীর জন্মের বহু পূর্বে জীবিত ছিলেন। তার বিগত জীবন সম্পর্কে নর্তকীটি যে সব গোপনীয় কথা উল্লেখ করে তা স্বাভাবিক ভাবে জানা সম্ভব ছিল না। মহিলা নর্তকীর শরীরে জন্ম থেকেই অস্ত্রোপচারের দাগ ছিল। জানা যায় আউঙ্গবালা অপারেশনের সময় মারা যায়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় উদাহরণ দা উন নামে এক বৃদ্ধা মহিলার। দা উন তাঁর বড় বোনের স্বামীকে বিয়ে করে ছিলেন। তাঁর বড় বোন থাইরয়েড গ্লাণ্ডের অপারেশানে মারা যায়। পরে দা উনের একটি মেয়ে জন্ম নেয়। তার গলায় অস্ত্রোপচারের দাগ ছিল। মেয়েটি তার মৃতা সৎমার সব ঘটনা বলতে পারতো এবং দা উন মৃতার ছেলেমেয়েদের অন্যায় শাস্তি দিতো এমন কথাও জানায়। সে তার সৎভাই-বোনেদের জননীর স্নেহ-মমতা দিয়ে আদর যত্ন করতো।

সিংহলের ঘটনা

জ্ঞান তিলেখা বাড্‌ডিইথানা মধ্য সিংহলের হেহুনাউয়া নামক স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে ১৯৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করে। মাত্র এক বছর বয়সের সময় সে অন্য এক মাতা পিতার কথা বলতে সুরু করে এবং বছর দুয়েক বয়সের সময় পূর্ববর্তী জীবনের স্পষ্ট উল্লেখ করে। সে জানায় অন্য এক স্থানে তার মা বাবা ও ভাই-বোনেরা আছে। প্রথমে সে পূর্বে জন্ম স্থানটির নাম বলতে পারেনি। কিন্তু কিছুকাল বাদে তাদের বাড়ীতে তালাওয়াকেলা শহর থেকে কয়েকজন অতিথি বেড়াতে আসেন। তাঁদের কাছে ঐ শহরের নাম শোনামাত্রই সে জানায় তার পূর্বের বাড়ী তালাওয়াকেলা শহরে। এরপর সে সেখানে যেতে চায় এবং বাড়ীর জন্য সকল আত্মীয়-স্বজনের ও শহরের বিস্তারিত কাহিনী বলতে থাকে।

জ্ঞান তিলেখার বিবরণের সঙ্গে তালাওয়াকেলা শহরের একটি পরিবারের হুবহু মিল দেখা যায়। ১৯৫৪ সালে ৯ই নভেম্বর তিলেখা রত্ন নামে তাদের এক ছেলের মৃত্যু হয়। ১৯৬০ সালে জ্ঞান তিলেখার পিতামাতা তাকে সেই শহরে নিয়ে যান। সে সঠিকভাবে শহরের অনেকগুলি বাড়ী চিনতে পারে। তাদের নিজের বাড়ী যেখানে আছে বলে সকলকে নিয়ে আসে সেখানে সেই পুরোনো বাড়ীটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং বাড়ীর লোকেরা অন্যত্র চলে যায়।

তিলেকা রত্ন নামে যে ছেলেটির কথা মেয়েটি জানায় তারা অবশ্য এখানেই আগে থকেতো এবং বারো বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে তার মৃত্যুর অল্প পরে তার পিতামাতা সে অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করতেন। জ্ঞান তিলেখার প্রথম যাত্রায় দুই পরিবারের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

তালাওয়াকেলা থেকে বারো মাইল দূরে হাটন শহরে শ্রীপদ কলেজে তিলেকা রত্ন লেখাপড়া করতো। সেই স্কুলের তিনজন শিক্ষক জ্ঞান তিলেকাকে দেখতে আসেন এবং সে তিনজনের সঠিক পরিচয় বলে দেয়। পরে সে স্কুলের অনেক ঘটনা বলে।

১৯৬১ সালে জ্ঞান তিলেখাকে পুনরায় তালাওয়াকেলা শহরে আনা হয় এবং পরীক্ষা করার জন্য তিলেকা রত্নের আত্মীয়দের সনাক্ত করতে বলা হয়। মেয়েটি প্রত্যেককে যথাযত চিনতে পারে। সে সমবেত সকল লোকেদের মধ্যে ছেলেটির সাতজন আত্মীয় ও পরিবারের দুজন পরিচিত লোককে সঠিক বলে দেয়।

পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করতে পারে, এমন ব্যক্তিদের প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়। কেননা গল্পগুলি বেশ মুখরোচক আলোচনার ও বিচারের বিষয়। রাশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি সব দেশের বৈজ্ঞানিকরা এখন জন্মান্তরবাদ নিয়ে গবেষণা সুরু করে দিয়েছেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন পথিকৃৎ এবং তিনিই একমাত্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যিনি এই গবেষণার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন অথবা জটিল রোগের টোটকা ওষুধ বাতলে দেন। সেই ওষুধে রোগ মুক্তি হয় এবং অধিকাংশ ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে দেখা দেয়।

ব্যক্তি বিশেষের এই ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আজও আবিষ্কার করা যায়নি কিন্তু মোটামুটি ভাবে এটাকে আমরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জন্য সম্ভব বলে মনে করি। আমাদের শরীরের অন্য স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলি ছাড়াই মানব-মনের এই দুর্বোধ্য শক্তি ভবিষ্যতের সংবাদ বর্তমানে উপলব্ধি করতে পারে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় শব্দটা যথেষ্ট বিতর্কমূলক। অনেকের কাছেই তার অর্থ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, আবার বহুলোকে এর অস্তিত্ব মানতে চাইবেন না। প্রসঙ্গক্রমে এখানে জানিয়ে রাখতে চাই যুক্তির খাতিরে 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়' কথাটা হয়তো বিভ্রান্তিকর। কারণ আমরা সকলেই জানি যে ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ শরীরের যে সব যন্ত্র বা শক্তি দিয়ে পদার্থ বা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, ঐগুলি মোট চোদ্দটি বর্তমান : বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ - এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত—এই চারটি অন্তরিন্দ্রিয়। এখানে আমরা পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার বাইরে 'ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের' কথা বোঝাতে চাইছি। ব্যাকরণ মানতে হলে বলতে হয় পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়।

এই অধ্যায়ের বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের পরামনোবিজ্ঞানীরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করতে

পেরেছেন তা পাঠকদের কাছে বিশদভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পরামনোবিদ্যার পরিভাষায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে Extra Sensoay Perception (ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব) বলা হয় বা সংক্ষেপে E S P।

প্রধানতঃ E S P সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবে মনে আসতে পারে তা হল :

(১) ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব বলতে কি বোঝায়? (২) কেন এমন হয়? (৩) কাদের এ ক্ষমতা থাকতে পারে? (৪) কি ভাবে এই অনুভূতি কাজ করে? (৫) কখন কোন সময়ে এই অনুভব হতে পারে? (৬) বাস্তব জীবনে এর উপযোগিতা আছে কিনা?

জন্মান্তরের ঘটনাগুলি বাদ দিলে এ এক পরম বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত মেলে ধরে। কোনদিন হঠাৎ যদি সংবাদপত্র খুলে দেখতে পাই —

ক। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন জ্ঞান নেই এমন একজন আনাড়ী লোক মোটরগাড়ী অথবা জাহাজের ইঞ্জিনের জটিল গোলযোগ কি ভাবে হয়েছে বলে দিতে পারছে অথচ যে ত্রুটি ধরার জন্য অভিজ্ঞ মিস্ত্রীরা বহু পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছে। অথবা—

খ। থানায় চুরির খবর পৌঁছানোর আগেই কনষ্টেবল চোরকে ধরে ফেলেছে, চোরাই মালের হিসাবপত্র ঠিক ঠিক মিলিয়ে নিয়ে চোরের জবানবন্দী লিখেটিখে নিয়ে আগেই সমস্যা মিটিয়ে রেখেছে, তাহলে বিস্মিত না হয়ে কোন উপায় থাকে না।

মানব মনের কোথাও নিভৃতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে কাজ করে চলেছে এগুলো তারই উদাহরণ। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি কেমনভাবে একজনের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই রয়েছে।

সেটা চিকাগোর জর্জ মিলারের কাহিনী, বিস্ময়কর জীবন-

কাহিনী। মিলারের বয়স এখন পঞ্চাশ। শুধুমাত্র ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নির্ভুল নির্দেশে তিনি আজ বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারী।

মিঃ মিলার দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরে কোন এক যুদ্ধে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে বেশ কিছুকাল মিলিটারী হাসপাতালে থাকতে হয় তাঁকে। ১৯৪৪ সালে যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন তখন দেখা গেল তাঁর মাথায় আঘাত শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সুস্থ হয়ে তিনি এখন কতকগুলি ক্ষমতার অধিকারী হলেন যার উপস্থিতি এর আগে কোনদিন তিনি অনুভব করেন নি।

তাঁর নিজের জ্ঞানের বাইরেই তিনি কয়েকটি পরা-স্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তাঁর সামনে অন্য লোকে কোন কথা উচ্চারণ করার আগেই তিনি বুঝতে পারতেন সে কি বলতে চায় বা বলতে যাচ্ছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে তার পরিষ্কার আভাস পেতেন। ফলে সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর ইলিনিয়স শহরে আসবাবপত্রের এক ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরে সেলসম্যানের কাজ করার সময় দোকানের বিক্রি বহুগুণ বাড়িয়ে ফেললেন। খদ্দেররা কি চায় বা কি চাইতে পারে এবং সেইমত ব্যবস্থা তৈরি রেখে তিনি নিজের রোজগারপত্র বেশ ভালই করতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে ধীরে সুস্থে বড়লোক হওয়ার তাঁর ধৈর্য ছিল না, ভাবলেন জুয়া খেলে রাতারাতি বড়লোক হতেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু তাস পাশা বা ঘোড়ার রেসে এক পয়সাও জিততে পারলেন না বহু চেষ্টা করেও। নিজের সমস্ত জমানো টাকা উড়িয়ে দেবার পর মাত্র শ'খানেক ডলার পকেটে নিয়ে জীবনে প্রতিজ্ঞা করলেন জোর করে মনকে আর খাটাবেন না। স্বাভাবিক অবস্থার বিবেকের যখন যা নির্দেশ আসবে তাই মেনে সুখী থাকবার চেষ্টা করবেন।

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে মিলারের সঙ্গে এক আসবাবপত্রের কারখানার মালিকের আলাপ হয়। তার কাছ থেকেই তিনি

জানতে পারলেন বিছানা এবং সোফার গদীর মধ্যে যে লোহার স্প্রিং ব্যবহার করা হয় তা বাজারে একদম পাওয়া যাচ্ছে না। বহু আসবাবপত্রের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এই তারের পাকানো স্প্রিং যদি কেউ কয়েক গাড়ী যোগাড় করতে পারে তাহলে সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে, ব্যবসায়ীরা এখন যে কোন দামে সেই স্প্রিং কিনতে রাজী।

মিঃ মিলার এ ধরণের স্প্রিং কোথায় তৈরী হয় এবং এগুলো দেখতে কি রকম তার কিছুই জানতেন না তবু তিনি পরিষ্কার অনুভব করলেন এ ব্যাপারে তাঁর কিছু করার আছে। এই দুর্লভ বস্তুটি তিনি সংগ্রহ করে নিশ্চিত কিছু মোটা কমিশন পাবেন এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গেল।

ঠিক এই কথাই তাঁর বান্ধবীকে বলতে সে কোন আমল দিতেই চাইল না। বাইশ বছরের তন্বী জেনেট ঠাট্টা করে বললে—"জর্জ একটু বুদ্ধি দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করো। যারা এই ব্যবসাতে সারা জীবন কাটিযে দিল তারা যে জিনিস যোগাড করতে পারছে না সেখানে তোমার এমন একটা আজগুবি চিন্তায় কোন মানে হয না।"

" একটা কথা তোমায আজ আমি বলবো, জেনেট যা এর আগে কখনো কাউকে বলিনি। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর," মিঃ মিলার হেসে জবাব দিতে থাকেন, "আমার ভেতরে একটা কিছু হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। এবং সেই থেকে অনেক মজার ব্যাপারও ঘটে গেছে। আমি ঠিক যা বোঝাতে চাইছি তা হল, আমি ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা আগেই দেখতে পেয়ে যাই। এই স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে আবার আমার সেই রকম মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিত। এই আজ তোমার সঙ্গে কথা বলাটা যেমন একটা, বাস্তব সত্য ঘটনা তেমনি এটাও সত্যি যে খুব শিগগির আমি তিন লরী গদি তৈরি করার স্প্রিং যোগাড় করতে পারবো।"

এই কথাবার্তার দুদিন পরে মিলারের ভবিষ্যৎ বাণী ফলে গেল।

দিন দুয়েক বাদে কাজের থেকে ছুটি নিয়ে তিনি নর্থ ক্যারোলিনা রওনা হবার জন্য ট্রেনে চেপে বসলেন। ক্যারোলিনায় আসবাব-পত্রের ব্যবসাই প্রধান। কিন্তু সেখানের সমস্ত কারবারীরাই কাঁচামালের অর্থাৎ ঐ স্প্রিং-এর অভাবে হাত গুটিয়ে বসে আছে। মিলার তাদের কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করলেন। মিলারের এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য শুনে তারা হাসাহাসি করলো।

জেনেটকে চিকাগোতে টেলিফোন করার কথা ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় (১৮ই এপ্রিল ১৯৪৫) কথামত টেলিফোন করে তিনি জানালেন যে তাঁর ধারণায় তিনি আরো বদ্ধমূল হয়ে পড়েছেন, আজ কালেব মধ্যে স্প্রিং তিনি খুঁজে পাবেনই। তিনি বললেন—"আগামী রবিবার বাইশে এপ্রিলের মধ্যেই বাড়ি ফিরবো। শুধু মিঃ ক্লে-কে খুঁজে পেলেই আমার এখানকার কাজ শেষ হযে যাবে।"

—"মিঃ ক্লে আবার কে ?" জেনেট জানতে চাইলে।

–"লক্ষীটি, তুমি হেসো না, মিঃ ক্লে-কে আমিও চিনি না। ঐ নামটা কদিন থেকেই আমার মাথায় ঘুরে ফিরে জেগে উঠছে এবং কেবলই মনে হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা হলেই ঐশ্বর্যের সিংহ দরজা আমার সামনে অবারিত খুলে যাবে।"

পরেব রবিবাবে ২২শে এপ্রিল বিরাট এক লরি বোঝাই স্প্রিং নিযে মি. মিলার ইলিনিযস শহরে ফিরে এলেন। লরি চালিয়ে নিয়ে এসেছে সেই রহস্যময় মিঃ ক্লে'র জামাই উইলিয়ম বো। মিঃ ক্লে এক সময় বিছানাপত্র এবং সোফার গদি তৈরী করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে তিনি ব্যবসা বন্ধ করে দেন। তাঁর কারখানার গুদাম ঘরে পাঁচ লরির মত লোহার স্প্রিং ও গদি তৈরির জিনিষপত্র জমা হয়ে গিয়েছিল। মিঃ মিলারের সঙ্গে দেখা হবার আগে তিনি ঐ সব জিনিষপত্র বিক্রির কথা ঠিক ভাবেন নি।

উইলিয়ম বো পরে জানিয়েছিল সে আর তার শ্বশুর মিঃ ক্লে প্রথমে তো মিলারের কথা শুনে বেশ হকচকিয়ে যায়। মিঃ মিলার তাদের সোজাসুজি বলেছিলেন,—"আপনার গুদামে গদি তৈরির যে

সব জিনিষ পড়ে রয়েছে সেগুলো আমি অনায়াসে বিক্রি করে দিতে পারবো। আপনার বিক্রি করার ইচ্ছা আছে নাকি?"

মিঃ ক্লে ও তাঁর জামাইএর ইচ্ছা ছিল বৈকি। কিন্তু তাঁরা অবাক হয়েছিলেন চিকাগোর এক পঁচিশ বছরের যুদ্ধ ফেরৎ ছোকরা সৈনিক এত দূরে কোন খবরপত্র না নিয়ে তাঁদের খুঁজে বার করলো কি করে? আর তারা যে তাদের কারখানা বন্ধ করে সেখানে বে-আইনী চোলাই মদের কারবার করছে তাই বা জানলো কেমন ভাবে?

মিঃ জর্জ মিলার ছাড়া অবশ্য আর কেউ এই গোপন রহস্য জানতে পারে নি এবং জানা সম্ভবও ছিল না বোধ হয়। এই ভাবেই এপ্রিল মাসে মিলার তাঁর নিজের আসবাবপত্রের ব্যবসা সুরু করেন। ক্রমশই বারবার তিনি দুর্লভ কাঁচামাল অথবা দুষ্প্রাপ্য মেসিনপত্রের সন্ধান বাতলে বেশ মোটা রকমের দাঁও মারতে লাগলেন। প্রতি ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি (E S P) তাঁকে পথ দেখিয়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে জুয়ার বরাতের মতই প্রেমের ব্যাপারেও মিঃ মিলালের ভাগ্য খারাপ ছিল। রীতিমত বেশ বড়লোক হবার আগেই বিয়ে-থা করে সংসারে জড়িয়ে পড়তে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। জেনেটকে তিনি অপেক্ষা করতে বললেন।

বিয়ের ব্যাপারে জেনেট আর অপেক্ষা করতে রাজী না হওয়ায় মিলার বলতে বাধ্য হলেন,—"এসব কথা আমার বলার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তোমার আমার ভবিষ্যৎ বলতে আমি এ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি 'মিলিওনেয়ার' হবার আগে তোমাকে বিয়ে করলে কোনও দিন আর 'লাখপতি' হতে পারবো না অথচ সে জন্য যদি অপেক্ষা করে থাকি তাহলে তোমাকে হারাবো। তুমি অন্য আর একজনকে বিয়ে করবে কিন্তু সুখী হতে পারবে না, সে তোমার মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। দশ বছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করবে আর

তা মঞ্জুর হবে। আমি তখনও অবিবাহিত থাকবো, তোমার প্রতি সেদিনও আমার ভালবাসা আজকের মত গভীর থাকবে। আমি তোমায় জীবন-সঙ্গী করার দাবী জানাবো কিন্তু তুমিই এবার রাজী হবে না, কারণ·······যাকগে সে সব কথা।"

মিঃ মিলারের ভবিষ্যৎ বাণী মত জেনেট ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডিভোর্স করে। জর্জ মিলার তখনও অবিবাহিত, প্রথম দশ লাখের জমার অঙ্ক গড়ে তুলতে একটু বাকী এবং সেই দীর্ঘকাল বাদেও জেনেটকে বিয়ে করবার জন্যে আন্তরিক ভাবেই রাজী। প্রস্তাবও করেন জেনেটকে। কিন্তু সে রাজী হয় না। কারণ জেনেটের শরীরে তখন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের বীজানু স্থায়ী বাসা ভাবে বেঁধেছে।

মিলার এ সমস্তই অনেক দিন আগে জানতে পেরেছিলেন এবং তার দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তখনি জানিয়েছিলেন। জর্জ মিলার তাঁর এই আশ্চর্য ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু জীবনে শান্তি খুঁজতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন।

কত রকমের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি হতে পারে ?

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের বহু বিভিন্ন অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই। কারণ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, আস্বাদন ও আঘ্রাণের সাহায্য ছাড়া অতিমনের অধিকারী যা কিছু অলৌকিক কাজ করে থাকেন সামগ্রিকভাবে তা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের আওতায় পড়বে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকাশকে আলাদা ভাবে বলা হয়ে থাকে। Telepathy (অন্য ব্যক্তির চিন্তা উপলব্ধি করা), Clairvoynce (দূরবর্তী ঘটনার অন্যত্র তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন) কিংবা foreknowledge (ভবিষ্যৎ দর্শন বা বাণী)। আগের অধ্যায়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে নতুন কিছু উদাহরণের সাহায্যে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

টেলিপ্যাথি (Tolepathy)

কথাটার আক্ষরিক মানে হল, 'পরিচিত ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ ছাড়াই এক ব্যক্তির চিন্তা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা।' জনৈকা মায়ের জবানীতে নীচের ঘটনাটি উল্লেখ করা হল ঃ

"গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমার ছেলেকে যখন সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়ে বিদেশে যেতে হয়েছিল সে সময় আমি এক বিচিত্র পরা-স্বাভাবিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। নরফোক্ বন্দর থেকে তার জাহাজ ছাড়বার কথা। আমাদের বাড়ী পিট্সবার্গে, কিন্তু সে সময়ে আমি ডেট্রয়েটে আমার মেয়ের কাছে ছিলাম। তবু সেই দূরদেশে থাকা সত্ত্বেও আমি বন্দর থেকে ছেলের জাহাজ ছেড়ে যাবার দিনটি (যেটি যুদ্ধের গোপনীয়তার জন্য আগে প্রকাশ করা হয়নি) স্পষ্ট অনুভব করতে পারলাম। ২০শে নভেম্বর ভোররাত্রে আমি মেয়েকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম। আমি এত বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে প্রথমে ঠিকমত কোন কথাই বলতে পারছিলাম না, শেষে একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর তাকে জানালাম, "আজ ভোর পাঁচটায় 'জো' কিন্তু দেশ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল।" আমার অহেতুক উদ্বিগ্নতায় আমার মেয়ে কিছুটা বিরক্তি বোধ করে। কয়েকদিন বাদে সৈন্য ব্যারাকের অস্থায়ী গীর্জার ধর্মযাজক জো'র সই করা একটা কার্ড আমাদের পাঠানোর সময় লিখে জানায় যে জো' দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন রাত্রে চার্চের সমবেত প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিল। কার্ড পোষ্ট করার ছাপ ছিল ২৩শে নভেম্বরের। এর থেকে মনে হয় যে আমার ধারণার পরেও দু'তিনদিন জো দেশে ছিল। আমার ভুল হয়েছে দেখে আমার মেয়ে দৃশ্যত কিছুটা খুশী হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার কেন জানিনা মনে হতে থাকে যে কার্ডটাই ভুল নির্দেশ দিচ্ছে। আমি বাড়ীতে লিখে জানালাম যে ক্যালেণ্ডারের ২০ তারিখে যেন লাল-পেন্সিল দিয়ে গোল দাগ কেটে রাখা হয় এবং জো'কে তাদের ধর্মযাজকের পাঠানো কার্ডের ব্যাপার লিখে জানাই। তার উত্তর

আসে, "ধর্মযাজক বোধ হয় আমাদের কার্ডটি দু'তিনদিন তার কাছে রেখে দিয়ে থাকবে পোষ্ট করার আগে। কারণ আমরা ২০ তারিখ ভোর পাঁচটার দেশের মাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি।"

ক্লেয়ারভয়েন্স (Clairvoyance)

টেলিপ্যাথি ও ক্লেয়ারভয়েন্সের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু খুবই সামান্য। টেলিপ্যাথি সাধারণত অন্য ব্যক্তির মানস চিন্তা পঠনের অলৌকিক ক্ষমতাকে বলা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ক্লেয়ারভয়েন্স হয় দূরবর্তী কোন ঘটনার অন্যত্র তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন। অর্থাৎ আপনার দর্শনের বাইরে দূর দেশে যে দৃশ্য ঘটে চলেছে আপনার মনের পর্দায় তার প্রতিফলন ভেসে উঠলে ব্যাপারটাকে আমরা ক্লেয়ারভয়েন্সের উদাহরণ বলে মেনে নেব। নীচের উদাহরণ থেকে সেটা বোঝা যাবে।

"১৯২০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ের ঘটনা। আমি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। একটা সাদা জাহাজ যেন পরিষ্কার দিনের বেলা শান্ত সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। স্বপ্নের মধ্যেই আমি জাহাজের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম কোথাও জনমানবের কোন চিহ্ন মাত্র নেই। তারপর হঠাৎ-ই আমি জাহাজের বেড়ালটার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পযন্ত জাহাজের সর্বত্র খুঁজেও আমি কোথাও কোন বেড়ালের হদিশ পেলাম না। ডেকের উপর ফিরে এসে আমি মনে মনে তারিফ করলাম, জাহাজের ঝকঝকে সাদা রঙের মনে হয় কেউ যেন বালি দিয়ে ঘসে মেজে পরিষ্কার রেখেছে চারিদিক। এই সময়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।"

তারপর সারাদিন কাজের ভীড়ে স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন বিকেলের কাগজে এ্যান্টনিও জাহাজের সলিলসমাধির কথা ছাপা হয়েছে দেখলাম। পুরো সংবাদটা পড়ে খুব আশ্চর্য হয়ে যাই। জাহাজটার অত্যন্ত ভাল আবহাওয়ায় ভূমধ্য সাগরের ঢেউ-শূন্য শান্ত জলে ভরাডুবি ঘটেছে। অবশ্য কোন প্রাণহানি

হয়নি, খবরে আরো জানিয়েছে যে জাহাজের বেড়ালটি পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। এ ধরণের সংবাদে বেড়ালের উল্লেখ সেই প্রথম ও শেষবার আমি কাগজে দেখেছিলাম।

ভবিষ্যতের ধারণা (Fore knowledge)

সম্ভাব্য সব রকমের বাস্তব পথের সুযোগ না নিয়েই অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার উল্লেখ করার ক্ষমতাকে 'ভবিষ্যৎবাণী' বলা যেতে পারে। কম বেশি এ ধরণের ক্ষমতা কিন্তু অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানীদের কাছে উল্লেখযোগ্যরূপে বিবেচিত একটি ঘটনা এখানে তুলে দেওয়া হল:

"রোনাল্ড আর্থার আর্ণল্ডের বয়স মাত্র একত্রিশ বছর, পেশায় সে এ্যাকাউনট্যান্ট। ট্রোবিজ শহরের জর্জ হোটলে বেচারী একদিন (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫) বন্ধুর সঙ্গে বিয়ার খেতে যায়। জনৈকা ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ বাদে হোটেলে আসেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে আর্ণল্ডকে এক প্যাকেট তাস হাতে দিয়ে জানালেন যে এর থেকে এক একটি তাস বেছে নেওয়ার মধ্য থেকেই তিনি আর্ণল্ডের ভবিষ্যৎ বলে দেবেন। সে এক একটি তাস বেছে তোলে আর মহিলাটি নানা ধরণের ভবিষ্যৎবাণী করতে থাকেন। গোড়ার দিকে ছোটোখাটো ঘটনা বলার পর মহিলাটি জানালেন, আর্ণল্ডের বুকের ব্যথার রোগ হতে পারে—হার্টের দোষ দেখা দেবে।

কিন্তু তার পরের তাসটি তোলা দেখে ভদ্রমহিলা চুপ করে যান। মিঃ আর্ণল্ড তাঁকে সেটার ভবিষ্যৎবাণী করতে অনুরোধ করেন। ভদ্রমহিলা কিছুতেই বলতে রাজী হন না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর ভদ্রমহিলা হোটেল ছেড়ে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, "অক্টোবরের পর তোমার কোন ভবিষ্যতই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

কয়েক মাস বাদে নভেম্বরের আট তারিখে (১৯৫৬ সাল) দেখা গেল মিঃ আর্ণল্ড তার শোবার ঘরের বিছানায় মৃত পড়ে রয়েছেন —মাথার কাছে টেবিলে এ্যাসপিরিনের একটা খালি শিশি।

শোবার আগে সম্ভবত তার বুকে ব্যথা হয়ে থাকবে, এবং ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে বেচারী মারা যায়।

এই ধরণের অলৌকিক ও আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনার বিজ্ঞান-গ্রাহ্য ব্যাখ্যার সন্ধান করাই পরামনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। মানবমনের এই বিচিত্র ক্ষমতার উৎস খুঁজে বের করতে তাঁরা দৃঢ় সঙ্কল্প।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও মানসিক সচেতনতার বিভিন্ন স্তর

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে আমরা ঠিক পুরোপুরি সচেতন নই। একটা জিনিস আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে সচেতন মন মানব ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচায়ক নয়, অর্থাৎ সচেতন মন পূর্ণ ব্যক্তিত্বের একটা অংশ মাত্র। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সঠিক পরিচয় পেতে হলে আমাদের মানসিক সচেতনতার ঠিক কোন স্তরে এই ইন্দ্রিয় কাজ করে সেটা জানতে হবে।

মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে বলা চলে মানব মন তিনটি স্তরে কাজ করে থাকে, যেমন (ক) জাগ্রত সচেতনতা (খ) স্বপ্নাচ্ছাদিত সচেতনতা (গ) অবদমিত সচেতনতা। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব মনের এই তিনটি স্তরেই হতে পারে। পরামনোবিজ্ঞানের ভূমিকায় কি ভাবে E S P এই তিন পর্যায়ে কাজ করে তার উদাহরণ সহ বিবৃতি আছে বলে এখানে পুনরাবৃত্তি করা হল না।

সক্রেটিসের সেই বিখ্যাত, "মানব মাত্রেই নিজেকে অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত" উক্তিটি পরামনোবিজ্ঞানীরা নিজেদের গবেষণার বীজমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মনের দিগন্তের যে ব্যাপক বিস্তৃতি ও যে সীমাহীন জটিলতা রয়েছে তার সব কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাত্রা মেনে চলে না বা তা দিয়ে মাপা যায় না। সেখানেই তাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের কথা এসে পড়ে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের যে সব উদাহরণ এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা গেছে তা থেকে ধারণা হয় যে প্রায় সকলেই জন্মগত ভাবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের

অধিকারী কিন্তু অন্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এই অনুক্ত ইন্দ্রিয়টি ক্রমশ অবদমিত থাকতে থাকতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তাছাড়া এই সব অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ঘটনাগুলি সংগ্রহ করার কোন ধারাবাহিক পদ্ধতি আগে ছিল না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর ভারতবর্ষের অনেকেই তাঁর গবেষণার কথা জানতে পারেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে জানাতে শুরু করেন। সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকেই বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া গেছে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী কে হতে পারেন এব্যাপারে কোন পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়নি। সর্বসাধারণের মধ্যেই এর বিকাশ। তবু তুলনামূলক বিচার করলে বলতে হয় সভ্যজগতের আলো থেকে বঞ্চিত আদিবাসী এবং জন্তু-জানোয়ারদের এই ইন্দ্রিয়টি অত্যন্ত প্রখর। আসন্ন বিপদ-আপদ থেকে নিজেদের সচেতন করার অন্য কোন উপায় নেই বলেই বোধ হয় পশু পক্ষাদের এই ইন্দ্রিয়টি যথেষ্ট তীব্র। এর পরের স্থান আদিবাসীদের। তাদেরও এই ইন্দ্রিয়টি বেশ সজাগ এবং গতানুগাতক। বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারা ইন্দ্রিয়টিকে খুব বেশী কাজে লাগিয়ে থাকে।

সভ্য মানুষ এদিক দিয়ে সকলের নীচে রয়েছে। কারণ নিজেকে সজাগ ও সতক রাখার জন্য সে এত বেশী সুযোগ সুবিধে তৈরী করে নিয়েছে যে তাকে মনের এই লুকোনো শক্তির উপর নিভর করতে হয়নি কোনদিন। কিছু কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে দেখা যায় শহরের বাসিন্দাদের এই ক্ষমতা অনভ্যাসে ও অব্যবহারে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতির কিছুটা হাত রয়েছে এই ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপারে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ছ'হাজার লোককে আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করেছেন। তাতে দেখা গেছে আধ্যাত্মিক অনুশাসনে বিশ্বাসী মানুষেরা বিজ্ঞান সচেতন লোকেদের চেয়ে অনেক বেশী এই

শক্তিতে বলীয়ান। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিচার করলে আমরা প্রকৃত অবস্থাটি অনুধাবন করতে পারবো।

টেলিপ্যাথির সাহায্যে রক্ষা

পরীক্ষা করে দেখা গেছে মা ও সন্তানের মধ্যে টেলিপ্যাথির যোগসূত্র অনেক বেশী কার্যকরী এবং ভাবপ্রবণ অবস্থায় টেলিপ্যাথি সহজে কাজ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য সকলে কল্পনা বা ধারণা করে থাকেন এবং ক্বচিৎ তা আলটপ্‌কা খেটে যায়। সেগুলি E S P-র আওতায় ধরা হয় না। আমেরিকার নিউজার্সি শহরের বাসিন্দা শ্রীমতী মারিয়নের ঘটনাটি কিন্তু অতিমনের একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

ঘটনাটি ১৯৭৭ সালে ঘটেছিল। একরাত্রে তিনি কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলেন না, বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ ওপাশ ছটফট করছিলেন। এর আগের কয়েক রাত্রেও তিনি ঘুমাতে পারেননি। তাঁর নিজের রুগ্ন স্বাস্থ্য, পারিবারিক অশান্তি এবং নানাবিধ ব্যগতা ও হতাশায় তিনি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এবং সমস্ত কিছুর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

যেদিন তিনি আত্মহত্যা করতে একেবারে কৃতসঙ্কল্প সেদিন হঠাৎ যেন তার প্রিয় বান্ধবীর অনুরোধ শুনতে পেলেন, "না, না, আত্মহত্যা কোরো না, মারিয়ান।"

মারিয়ান প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। কারণ বন্ধুটি বহু দূরে ফ্লোরিডায় থাকে। এবং সম্প্রতি তার সঙ্গে দেখা হয়নি বা তার কথা মনেও আসেনি অথচ যেন স্পষ্ট তার গলা শুনতে পেলেন অন্তরে। বন্ধুটি বয়স্থা মহিলা, তার মৃতা মেয়ের সঙ্গে মারিনের চেহারার মিল থাকায় মারিয়নকে খুবই স্নেহ করতেন। কেন এমন হল তার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে মারিয়ন তখনকার মত আত্ম-হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। পরের দিন বিকেলে এক্সপ্রেস

ড্রেলিভারিতে বন্ধুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে ভদ্রমহিলা জানিয়েছেন যে আগের দিন মাঝরাত্রিতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং মারিয়নের জন্যে মন বিশেষ খারাপ হয়ে যায়। তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল যে মারিয়নের কোন অমঙ্গল হতে চলেছে। তাই তিনি বাকী রাত না ঘুমিয়ে মারিয়নের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। মারিয়ন কেমন আছে জানার জন্য অবিলম্বে পত্র লিখেছেন সকালেই।

চিঠিটি পড়ার পর মারিয়ন অত্যন্ত বিস্মিত হন। হাজার মাইল দূর থেকে তাঁর বন্ধু তার মৃত্যু চিন্তার কথা অনুমান করতে পেরে তাঁর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে তাকে যে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে এটা তিনি সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেন।

রীতিমত অলৌকিক

পরীক্ষা করে দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব আদিবাসী রয়েছে অল্প বিস্তর তারা সকলেই কিছু না কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সব থেকে প্রাচীনতম জাতি বলে ধরা হয়। অনেকে তাদের প্রস্তর যুগের অধিবাসী বলেও ঘোষণা করেছেন। কুইন্সল্যাণ্ডের পুলিশ বিভাগ অনুসন্ধানের কাজে সাহায্য করার জন্য অনেক আদিবাসীকে চাকরী দিয়েছে। কেবলমাত্র পায়ের ছাপ দেখে এরা লোকটির প্রায় হুবহু বর্ণনা দিতে পারে এবং সেই বর্ণনা অনুযায়ী বহু আসামীকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের পরীক্ষা করে দেখা গেছে অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চলের আদিবাসীরা (পরে বিশদ বিবরণ আছে) টেলিপ্যাথি ও ক্লেয়ারভয়েন্সে বিশেষ দক্ষ। তাদের এই সব ক্ষমতার বিধিবদ্ধ পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে শতকরা পঞ্চাশেরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা সঠিক বলতে পেরেছে। এমনি একটি পরীক্ষায় একটা বাক্সে গোপনে সিগারেট রেখে সেটি গালা দিয়ে সীল করার পর

তিনজন আদিবাসীকে বাক্সে কি রাখা আছে প্রশ্ন করলে একজন সিগারেট আছে বলতে পারে এবং অন্য দুজনেই তামাক এবং কাগজ রাখা আছে বলে। অর্থাৎ তারাও প্রায় সঠিক বলতে পারে।

আফ্রিকার ওঝা বা গ্রাম্য পুরোহিতেরা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বহু বিচিত্র ক্ষমতা দেখিয়ে থাকে। দাহোমীর নামে এক গ্রাম্য পুরোহিত জনৈক সেনাবাহিনীর অফিসারের কাছে নীচের ঘটনাটি দেখিয়েছিল। অফিসারের রিপোর্টটি পরীক্ষিত সত্য।

সেই গ্রামের সর্দার এবং অন্যেরা একবার দীর্ঘ দিন শিকারে কাটিয়ে গ্রামে ফেরে। দলপতি পুরোহিতটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর কুড়িটি স্ত্রীর মধ্যে কেউ তার অনুপস্থিতিতে কোন অবৈধ কাজ করেছে কিনা। ওঝাটি প্রত্যেক বউয়ের দাঁতখোটার কাটি চেয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি কাঠি নিজের গালে ছোঁয়াতে থাকে। শেষে সে একটি কাঠি নিয়ে জানায় যে এই কাঠিটি যে বউয়ের সে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত ছিল। বউটি তার অন্যায় স্বীকার করে। এবং দেখা গেল সর্দারের অনুপস্থিতির সুযোগে সর্দারের জোয়ান ভাইপোর সঙ্গে বউটির অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ঘটনাটি ওঝার পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারণ সে নিজেও দলপতির সঙ্গে শিকারে গিয়েছিল। তাছাড়া দাঁত খোটার কাঠিগুলি তাকে এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কোনটি কোন্ বউয়ের সেটা তার জানা সম্ভব ছিল না।

পশুদের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের ঘটনা

আগেই বলা হয়েছে জন্তুদের মধ্যে অতিমনের বিকাশ আদি-বাসীদের থেকেও অনেক বেশী। পশুবিদরা মাঝে মাঝে জন্তুদের কিছু কিছু আচরণের কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে পারেন না—সেগুলিকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ ছাড়া অন্য কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

রাশিয়ার প্রখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ব ও শারীর বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ ডব্রু-বকটেরেভ কুকুরদের টেলিপ্যাথির ক্ষমতার পরীক্ষা করেছিলেন।

পরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে কিছু কিছু পশুদের, বিশেষ করে কুকুরদের চিন্তাশক্তি বিদ্যমান।

'মিস ডোসি' নামে একটি মাদী কুকুরকে একবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে দেখানোর জন্য আনা হয়। হোয়াইট হাউসের কুকুর বিশেষজ্ঞ প্রথমেই কুকুরটিকে সব দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখে নেন। কুকুরের মালিক জানায় যে কুকুরটি অন্যের চিন্তা ও প্রশ্ন অনুধাবন করতে পারে। সকলেই একথায় সন্দেহ প্রকাশ করে। মালিক ভদ্রলোক সেই বিশেষজ্ঞকে কুকুরের আড়ালে পিঠের দিকে খুশিমত হাতের আঙুল দিয়ে সংখ্যা নির্দেশ করতে অনুরোধ করেন। কুকুরটিকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কটা আঙুল' ? সে নির্ভুলভাবে ঘেউ ঘেউ করে সংখ্যাটি জানায়। কুকুরটিকে এবার পাশের একটি কাচের জানালা দেওয়া ঘরে রাখা হয় এবং বিশেষজ্ঞ বাড়ীর বাইরে বাগানে গিয়ে পিঠের পেছনে হাত রেখে আবার আঙুল বার করেন। কুকুরটি এবারেও ঠিকভাবে ডাকে। আরো কয়েকবার হোযাইট হাউসে এবং অন্যত্র এই সংখ্যার পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু মিস ডোসিরের একবারও ভুল হয় নি।

সদর দরজা দিয়ে বাইরে রাস্তায় আসার সময় মিস ডোসির মালিক তাকে প্রশ্ন করলেন, "এখন রাস্তায় কজন লোক সবশুদ্ধ ?" কুকুরটি তিনবার ডাকে। জিজ্ঞেস করা হল, "তাদের মধ্যে শ্বেতকায় কজন ?" কুকুরটি তার মালিক ও বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে দুবার ডাকে। তাকে আবার প্রশ্ন করা হল, "অশ্বেতকায় কজন আছে ?" কুকুরটি একবার ডাকে। লক্ষ্য করে দেখা গেল রাস্তায় এক নিগ্রো ভদ্রলোক সে সময়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব কখন হতে পারে ?

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব কখন হবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আমেরিকার শ্রীমতী জিন ডিক্সন, যিনি প্রয়োজন মত যখন খুশী টেলিভিশনে অথবা পার্টিতে E S P অনুভব করতে পারেন তিনি

অবশ্য ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ দেখা গেছে কোন সুতীব্র বাসনা বা আগ্রহ থেকে এই অনুভূতির প্রকাশ হয়ে থাকে। লিপ্সা অথবা কামনা থেকেই বিভিন্ন মানসিক অনুভূতির জন্ম; E. S P-র ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। বিভিন্ন কেস হিষ্ট্রি পরীক্ষা করে দেখা গেছে নিবিড় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই অনুভাবনা দেখা দিতে পারে। কোন প্রিয়জন হয়তো বিপদে পড়েছে কিংবা কোন আসন্ন বিপদ কোন প্রিয়জনের অদূরেই ঘটতে চলেছে, এমন অবস্থায় তার নিকট আত্মীয়ের E. S. P. অনুভাবনা হতে পারে। তবে এমন বিশেষ অবস্থা ছাড়াও সাধারণ মানসিক অবস্থাতেও E. S. P. অনুভাবনার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। এবার আমরা কতকগুলি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটা বিচার করে দেখতে পারি।

শ্রীমতী জিন ডিক্সনের অসাধারণ ক্ষমতা

শ্রীমতী ডিক্সনকে আমেরিকার সংবাদ পত্রে 'ভবিষ্যৎদ্রষ্টা' বলা হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে তাঁকে ভবিষ্যৎবাণী করতে বললে তিনি তা করতে পারেন। ১৯৫৬ সালে কোন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীমতী ডিক্সনকে ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনের ফলাফল জানতে চাইলে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে ডেমোক্রাট দলের কেউ নির্বাচনে জয়ী হবেন বটে কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ের মধ্যেই হয় তাঁকে হত্যা করা হবে অথবা তিনি মারা যাবেন। প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির নির্বাচনে জয়লাভ এবং মৃত্যু ডিক্সনের ভবিষ্যৎবাণীকে পরবর্তীকালে সত্য প্রমাণিত করেছে।

অকস্মাৎ অনুভাবনার ঘটনাও আছে। ওয়াশিংটনে একদা এক নৈশ ভোজনের পার্টিতে শ্রীমতী জিন ডিক্সন ঘটনাক্রমে নেহাৎ-ই আচমকা মিস ইলিনর বোমগার্ডনারের হাত ধরেন। মিস ইলিনর সে সময় প্রায়, সতেরো বছর একটানা আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রাঙ্ক মার্ফির সেক্রেটারীর কাজ করছিলেন। শ্রীমতী

ডিক্সন তাঁকে জানালেন যে তিনি অদূরেই নতুন কাজ খুঁজতে থাকবেন এবং শিগ্রই তাঁর খুব নিকট পরিচিত কেউ মারা যাবে। একথা শুনে মিস ইলিনর বেশ বিস্মিত হন, হয়তো কিছুটা অবিশ্বাসও করেছিলেন। কিন্তু সেই পার্টি শেষ হবার সামান্য কিছুকাল পরেই তিনি জানতে পারলেন বিচারপতি মার্ফি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন! মিস্ ইলিনর এর পরে সুপ্রীম কোর্টের অন্য দপ্তরের কাজে যোগ দেন—শ্রীমতী ডিক্সনের ভবিষ্যৎবাণী আবার সত্যে পরিণত হয়। তাঁকে নিয়ে এধরণের বহু উদাহরণ আছে। অতি সম্প্রতি তাঁর বিস্ময়কর ভবিষ্যৎবাণী ও অলৌকিক ঘটনাগুলি নিয়ে 'ক্রিষ্টাল বল' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা সেটি পড়তে পারেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার অনেক আগেই (প্রায় তিন বছর আগে) তিনি তা শ্রীগিরিজা-শঙ্কর বাজপেয়ীকে জানিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ বিভাগের পরিকল্পনা অত আগে ইংরাজ জাতি হয়তো চিন্তা করে নি।

কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত

এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাতে দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুই প্রিয় পাত্রের পরস্পরের জন্য ভাবনা-চিন্তাতে সাধারণ E. S. P অনুভাবনার উদয় হয়েছে। কচ্ছের শ্রী পি. এন. নায়ারের ঘটনাটি আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। শ্রীনায়ারের জবানীতেই তা এখানে তুলে দেওয়া হল:

"আমার এই অভিজ্ঞতাটি ১৯৫৩ সালে হয়েছিল এবং সে সময়ে আমি ডায়েরীতে তা লিখে রেখেছিলাম। সে সময়ে আমার স্বর্গতা স্ত্রী কোনালাম, আমার মা ও এক শ্যালক গান্ধীধামে (কচ্ছ) থাকত কিন্তু আমাকে কার্যোপলক্ষ্যে গান্ধীধাম থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে আদেসর নামে এক জায়গায় থাকতে হত। আমি মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ীতে আসতাম। ১৯৫৩ সালের ২রা আগষ্ট আমি আদেসরের রেল কলোনীতে এক বন্ধুর সঙ্গে তার কোয়ার্টারে

ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা বিশ্রী স্বপ্নে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি যেন দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমার কাছে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ সে পড়ে যায়। তার মুখের চেহারায় একটা আতঙ্কের ভাব। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখি আমি একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছি ; আমার ভীষণ একটা অস্বস্তি হতে থাকে। আমি ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে থাকি এবং কয়েক মিনিট বাদে একটু সুস্থ বোধ করলে আবার শুয়ে পড়ি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার স্বপ্ন দেখতে থাকি। এবারে আমি অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে আমি দেখলাম, আমার মা ভগবানের নাম জপতে জপতে অসহায়ভাবে ঘর বার করছেন। সিনেমার ছবির মত পরিষ্কার আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার আবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘর্মাক্ত কলেবরে ও আগের সেই তীব্র অস্বস্তিতে আমার বুক ধুক্ ধুক্ করতে থাকে।

"আমার ভেতরে কে যেন বারবার বলতে থাকে যে আমার এখনই গান্ধীধামে যাওয়া প্রয়োজন। আমি আমার বন্ধুকে ঘুম থেকে জাগিয়ে এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নের কথা জানালাম ...... এবং বাকী রাতটুকু কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

"পরের দিন সকালেই আমি স্ত্রীর একটা চিঠি পেলাম। আমাকে দেখার জন্য সে ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছে। আমি যেন যত শীঘ্র সম্ভব একবার গান্ধীধামে যাই । বিকেল পাঁচটা নাগাদ আদেসরের ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে জানালেন যে গান্ধীধাম থেকে টেলিফোনে খবর এসেছে যে আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

"ঠিক সেই সময়ই প্রবল বৃষ্টি ও বন্যায় আদেসর ও গান্ধীধামের মধ্যে রেল অথবা সড়কে যাতায়াতের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অলক্ষ্যে কেউ যেন আমাকে পায়ে হেঁটে যাবার নির্দেশ দেয়। আমি তাই মেনে নিয়ে পদব্রজে যাত্রা করলাম। তৃতীয় দিনে বাড়ী পৌঁছে দেখলাম আমার স্ত্রী নেই। ৩রা আগষ্ট রাত্রে অঞ্জর হাসপাতালে সে মারা গেছে।

"পরে আমার মা ও শ্যালকের কাছে স্ত্রীর অসুস্থ হয়ে পড়ার বিশদ ঘটনা জানতে পারি। ঠিক যে সময়ে আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি সেই সময়েই আমার স্ত্রী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। আর আমার মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বারবার ঘরবার করতে করতে ভগবানকে ডাকছিলেন বিপদ থেকে মুক্তির আশায়।"

অন্যত্র অবস্থানকারী প্রিয়জনের কুশল সংবাদ জানার আগ্রহ থেকে যে E. S. P অনুভাবনা হতে পারে তার প্রমাণ নীচের ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে।

মাদ্রাজের শ্রী পি. ভি. রামচন্দ্র তাঁর যে অভিজ্ঞতা লিখে জানিয়েছিলেন তা এই ধরণের, "জুলাই ১৯২০তে আমি মাদ্রাজের জেনারেল হাসপাতালে অর্শের অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্তি হই। ভর্তি হবার দিন মাঝ রাত্রে আমি পরিষ্কারভাবে স্বপ্নে দেখলাম আমাদের গল্পকথার রাজা হরিশ্চন্দ্রের ছেলেকে সাপে ছোবল মারতে। স্বপ্নটি দেখার পর ভীষণ অস্বস্তিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং বাকী রাতটুকু আমি আর ঘুমাতে পারি না। পরের দিন সকালে আমি খবর পেলাম যে আগের দিন রাত্রিতে আমার এগারো বছরের ছেলেটি সাপের কামড়ে মারা গেছে।"

উপরের এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়াও সাধারণ মানুষেরা প্রয়োজন দেখা দিলে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব করতে পারেন।

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের প্রকৃত তাৎপর্য কি ?

প্রশ্নটিকে আর একটু অন্যভাবে বললে এই রকম দাঁড়াবে, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? সম্ভবত E. S.P-র এই ঘটনাগুলিকে মেনে নিতে থাকলে আমাদের আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতিকে ক্রমশ বিজ্ঞান সম্মতভাবে স্বীকার করে নিতে হবে।

এই বিবৃতিতে অনেকে হয়ত সচকিত হয়ে উঠবেন। কথাটা

বিন্দুমাত্র সহজ সুরে কিন্তু বলতে চাইনা আমরা। প্রশ্নের এই দিকটাকে যথেষ্ট গভীর ও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখার দরকার রয়েছে। কোন কিছু স্থির সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে নেবার আগে নীচের উদাহরণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের যে দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, সেটা একবার বিবেচনা করে নেওয়া দরকার।

পূর্বে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের রাণী রাসমণিকে মন্দিরে চপেটাঘাতের ঘটনাটি টেলিপ্যাথির ব্যাপার। অর্থাৎ অন্যের চিন্তাকে অনুমান করতে পারা—কোন রকম বাস্তব পথে যোগাযোগ না করে দুই ব্যক্তির মানসিক যোগাযোগকে বলা যেতে পারে।

মণ্টে ক্যাসিনো (ষষ্ঠ শতাব্দী) মঠের অধ্যক্ষ সেণ্ট বেনেডিক্ট জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখলেন তাঁর বোনের আত্মা পায়রা রূপে স্বর্গের পথে এগিয়ে চলেছে। মাত্র তিন দিন আগেই তাঁর বোন স্কলাসটিকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কাছের এক কনভেণ্টে বোন থাকে। বোনের মৃত্যু সংবাদ এই ভাবে ইন্দ্রিয়াতীত উপায়ে প্রথম তিনি জানতে পারেন। এর সমান্তরাল ঘটনা আমাদের দেশে রয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মন্দিরে বসে থাকতে থাকতে একবার দেখলেন মথুরাবাবু ঘোড়ায় টানা রথে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছেন। তার অল্প পরেই মথুরাবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেলেন।

এই ঘটনা দুটিকে Clairvoyance-এর দৃষ্টান্ত ধরতে হবে। কারণ, অন্যত্র যে ঘটনা ঘটে গেছে বা ঘটতে চলেছে অনুভাবী অতিমনের সাহায্যে তা ভিন্ন জায়গায় বসে জানতে পারছেন। সত্য কিনা যাচাই করে দেখা হয়েছে এমন একটা Clairvoyance-এর উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীর এক রাতের কথা। বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। জেনারেল নাথান এফ টুইনিং-এর স্ত্রী উত্তর কারোলিনায় শার্লট শহরে তাঁদের বাড়ীতে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ এক বজ্রপাতের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলেই দেখতে পেলেন বিছানার

পায়ের দিকে তাঁর স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ তিনি বেশ ভাল করেই জানেন যে তাঁর স্বামী তখন পৃথিবীর প্রায় অন্য প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের রঙ্গ-মঞ্চে বায়ুসেনাবাহিনীকে পরিচালনা করছেন।

"আমি আমার স্বামীর মুখ ও হাত দুটি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম", শ্রীমতী টুইনিং জানান। "তারপরে দেখলাম পাটাতন থেকে তার হাত ক্রমশ আলগা হয়ে ফস্কে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে সে অতল জলে তলিয়ে গেল। আমি এত বেশী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম যে ভাবলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

দুর্ভাবনার জন্য শ্রীমতী টুইনিং ঘুমোতে পারলেন না, তিনি রান্নাঘরের বাতি জ্বালিয়ে কফি তৈরী করতে বসলেন। পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলা রান্নাঘরের আলো এত রাত্রে জ্বলতে দেখে টেলিফোন করে খোঁজ নিলেন কেউ অসুস্থ কিনা। শ্রীমতী টুইনিং তাঁকে তাঁর দুর্ভাবনার কথা জানাতে প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা বাকী রাতটুকু তাঁকে সঙ্গ দিতে তাঁর ফ্লাটে চলে আসেন। পরের দিন শ্রীমতী টুইনিংয়ের এক প্রবাসী বন্ধু ট্রাঙ্ককলে তাঁকে যোগাযোগ করে তাঁর কাছে কয়েক দিন বেড়িয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন। এই বন্ধুটির স্বামীও একজন সেনাবাহিনীর অফিসার। কিন্তু শ্রীমতী টুইনিং রাজী হলেন না।

তার পরের দিন সেই ভদ্রমহিলা শ্রীমতী টুইনিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে কয়েকদিন তাঁর কাছেই থাকার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে শ্রীমতী টুইনিংয়ের একটু খটকা লাগে। পরে তিনি জানলেন বান্ধবীর স্বামীও যুদ্ধে রয়েছেন এবং কেউই স্বামীর সঠিক খবর জানেন না—এতে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

বন্ধুর সঙ্গে কয়েকদিন বেশ শান্তিতেই কাটে। কিন্তু বন্ধু চলে যাবার পরই শ্রীমতী টুইনিং স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার খবর পান। জেনারেলের প্লেন সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অবশ্য শ্রীমতী টুইনিংকে যেদিন নিখোঁজ হওয়ার খবর

পাঠানো হল সেদিন বিকালেই কিন্তু সমুদ্রের বুক থেকে দুটি লাইফ-বোটের যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়, তার একটিতে জেনারেল ছিলেন। খুবই ভাগ্যের জোরে সে যাত্রা সকলে বেঁচে যায়।

জেনারেল টুইনিং তাঁর স্ত্রীর সেই বিচিত্র স্বপ্নের কথা কিছু জানতে পারার আগেই তাঁর বাবাকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে প্লেনটি জলে পড়বার সময়ে তিনি বৃষ্টির মধ্যেও পরিষ্কার তাঁর স্ত্রীকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতে পান। প্লেনটি জলে পড়ে একেবারে দু'টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ডুবে যায়। যেহেতু তিনি জেনারেল তাই সবশেষে লাইফ বোটে উঠেন। বোটে ওঠবার সময় তাঁর হাত ফসকে যায় এবং স্ত্রীর দেওয়া সোনার ঘড়িটা কব্জি থেকে খুলে জলে তলিয়ে যায়।

সেই আপাত সঙ্কটের মধ্যেও তিনি স্ত্রীর কাছে বকুনি খাওযার চিত্রটা ভেবে নিয়ে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

আধ্যাত্মিক নিয়মের বন্ধন

আমরা অনেকেই প্রথাগত ভাবে মেনে এসেছি আমাদের প্রাণের উৎস হচ্ছে আত্মা এবং বিশ্ব-চরাচরের সব কিছুই মঙ্গলময় ঈশ্বর পরিচালনা করছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আত্মার কথা মানেন না, তাঁরা মানব দেহকে জৈবিক পদার্থ বলে ধরে নিয়েছেন এবং অশারীরিক কিছু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আছে বলে স্বীকার করেন না। ভগবান ও আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের যে ধর্মের অনুশাসন রয়েছে তার সব কিছুই অতএব মিথ্যে হয়ে যায়, কারণ আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপরেই ধর্মের স্থায়িত্ব। বিশ্বের সবধর্মের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা সংঘাত বর্তমানে দেখা দিয়েছে।

যুক্তিবাদীরা ধর্মের সংজ্ঞা বা অনুশাসন বিশ্বাস করেন না। তাঁরা সব কিছুরই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ খোঁজেন। সেদিক থেকে দেখলে এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের ঘটনাগুলিকে আমাদের

গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। একদিক থেকে ধরতে গেলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের চিরাচরিত সংঘর্ষ থেকেই এই পরামনোবিদ্যার গবেষণার উৎপত্তি। ধর্মের যে সব তথ্য বাস্তব মতে প্রমাণিত করা সম্ভব সেসব দিকে তাই অনেকেই গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছেন। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবকে যেহেতু জড়বাদী বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বিচার করা যায় না অতএব সেগুলোকে আধ্যাত্মিক নিয়মের দ্বারা চালিত বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই এই প্রশ্নের সুরুতেই আমরা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে E. S. P. আমাদের একদিন হয়তো সকলকেই ধর্মে বিশ্বাসী করে তুলবে!

যাদু বিদ্যা ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবনা

বিভিন্ন উদাহরণ ও আলোচনা থেকে আমরা E. S P. সম্পর্কে দুটি মূল ধারণা করতে পারি। প্রথম, জাগতিক কিছু কিছু ঘটনা আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই সঠিকভাবে অনুভব করতে পারি। দ্বিতীয়, এই অনুভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করা বা সুযোগ মত ঘটানো সম্ভব নয় কারণ এই মানসিক অবস্থা নিশ্চিত নির্ধারিত কোন নিয়ম মেনে চলে না।

'অনেকেই তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন, ব্যাপারটা এতই অনিশ্চিত হলে যাদুকরের ষ্টেজেতে প্রয়োজন মত যখন খুশী ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের খেলা কি করে দেখিয়ে থাকে? ষ্টেজের উপরে সর্বসমক্ষে যাদুকরের টেলিপ্যাথির আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে অনেক দর্শকেই বিমোহিত হয়ে যান। তাঁদের অবগতির জন্য বলা যায় E. S. P-র বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধান করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান গেছে যে এই 'মানসিক ক্রিয়াটি' বারবার ধারাবাহিক ভাবে সফল হতে পারে না, পারা সম্ভব নয়, অথচ ষ্টেজের যাদুকরের সেই ধরণেরই কিছু একটা প্রয়োজন। অতএব কোন যাদুকরই তেমন অনিশ্চিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবনার উপর নির্ভর করবে না। যেসব ক্ষেত্রে বা অবস্থায় সে তার নিজের পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল দর্শকের

উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবে না সেখানে তার সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ডাঃ ডি. এস ওয়েষ্ট তাঁর 'সাইকিক্যাল রিসার্চ টু টুডে' বইটিতে যাতুকরদের প্রচলিত কিছু নিয়ম কানুনের কথা লিখেছেন।

জোর করে গছিয়ে দেওয়া (Forcing Method)

যাতুকরদের কিছু কিছু টেলিপ্যাথির চাতুরী জোর করে গছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দর্শকদের মধ্যে একজন কেউ একটা তাস বেছে নিয়ে হয়তো ভাবছেন তিনি নিজের খুশি মত তাস নিয়েছেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেখা গেল যাতুকর তাসটি বলে দিলেন। জোর করে গছিয়ে দেবার সব থেকে সহজ পদ্ধতি হল যাতুকরের হাতের কায়দা। সাধারণতঃ দেখা গেছে দর্শক ভদ্রলোক তাসের প্যাকেটটি তুভাগে কাটানোর পর নিজের ভাগের প্রথম তাসটি বেছে নেন। তাস কাটানো ও বেছে নেওয়ার এই তুটো কাজের মধ্যে যে অল্প বিরতি সেই ফাঁকে হয়তো যাতুকর দর্শককে কথায় ভুলিয়ে তাঁর নিজের একটি তাস উপরে রেখে দিলেন। অন্য আর একটি চতুর পদ্ধতিতেও যাতুকর কখনো কখনো নিজের পছন্দ মত তাস ধরিয়ে দিতে পারেন—তবুও সে ক্ষেত্রে নির্বাচনকারীর কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। যাতুকর নিজের দিকে তাদের উল্টোপিঠ রেখে পরপর কতকগুলি তাস নির্বাচনকারীকে দেখিয়ে তার থেকে যে কোন একটিকে মনে করে রাখতে বলেন এবং নিজে সঠিক ভাবে তা সনাক্ত করে দেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন যে বিশেষ ভাবে তাস সাজিয়ে দিলে প্রত্যেক নির্বাচনকারীই সাধারণতঃ বিশেষ একটি বা তুটি তাসের মধ্যেই নিজের তাস নির্বাচন করে থাকে। যেমন কাউকে যদি চট করে একটা ফুলের নাম বা ইংল্যাণ্ডের কোন শহরের নাম ভাবতে বলা হয় তাহলে সচরাচর দেখা গেছে প্রায় সকলেই 'গোলাপ' কিংবা 'বার্মিংহাম' ভেবে থাকে। এসব ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে যাতুকরের ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুলটাকে তিনি এমন

ভাবে প্রকাশ করেন যেন ইচ্ছে করেই ভুল করলেন—এবং তাতে তাঁর কৃতিত্বের ঘটা আরো বেড়ে যায়।

অনুভাবনার খেলায় চাতুরী (Psychic Trick)

এধরণের অনুভাবনার খেলায় সব থেকে পুরোনো একটা চাতুরী হল একটা ধাপ এগিয়ে' থাকার কায়দা। যাদুকর দর্শকদের কয়েক জনকে প্রশ্ন কাগজে লিখে খামের মধ্যে বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর সকলকে ভাল করে দেখিযে এক একটি খাম তুলে কপালে আলতো করে ছুঁইয়ে, ভেতরের প্রশ্নটি না দেখে চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে জবার দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। এই ধরণের খেলায় একটি খামে যাদুকরের নিজের বিশ্বস্ত লোক দর্শক সেজে পূর্ব নির্ধারিত এক প্রশ্ন রেখে দেয়। এই খামটি সব শেষে তোলেন যাদুকর কিন্তু তার প্রশ্নটি প্রথম খামটি তোলার পর চেঁচিযে বলে দেন। তারপব যেন নিজের জবাব মিলিয়ে দেখার জন্য প্রথম খামটি খুলে দেখতে থাকেন—আসলে সেই সূত্রে তিনি ঐ প্রশ্নটি পড়ে ফেলেন এবং দ্বিতীয় খাম হাতে নিয়ে সেই প্রথম খামের আগে পডা প্রশ্নের জবাব দেন। এই ভাবে পরপর চলতে থাকে এবং দর্শকরা দেখেন যে তাদের প্রশ্নগুলি ঠিকঠিক 'উদ্ধৃত' হচ্ছে যাদুকরের স্মৃতি থেকে। এই কায়দাগুলো পড়ার সময় বা লেখার সময় খুবই ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। কিন্তু যাদু খেলায় নিয়মের থেকে দেখানোর আড়ম্বরটা (শোম্যানশিপ) আসল। খেলা দেখানোর সময় খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে কায়দা করে দর্শকদের ভুলিয়ে বা অন্যমনস্ক রাখতে পারার মধ্যে খেলার সফলতা নির্ভর করে। প্রয়োজন মত যে সব যাদুকর খেলার রীতির পরিবর্তন করতে পারেন তাঁরাই বড় যাদুকর। অবশ্য একথা ঠিক যে রঙ্গ-মঞ্চের 'টেলিপ্যাথি' মিথ্যে চাতুরী হলেও খেলা দেখে আমাদের আনন্দের ভাগে কিছু কম পড়ে না বরঞ্চ যাদুকরের আসল ফন্দীটা ধরবার অদম্য উৎসাহ বেড়েই যায়।

জন্তুদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

যাদুকরদের তথাকথিত টেলিপ্যাথির প্রয়োগের মতই অনেকে খদ্দেরের ভবিষ্যৎ গণনায় পাখী, গরু ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে থাকে। এই ধরণের ব্যবসা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার আগে জন্তুদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

বহু উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করা চলে যে টেলিপ্যাথি মানুষ ছাড়াও অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা দিতে পারে। প্রখ্যাত প্রাণী বিজ্ঞানী উইলিয়াম জে, লঙ তাঁর How Animals Talk গ্রন্থে পশুদের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবনার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। পশু থেকে মানুষের ভেতরে চিন্তার আদান প্রদানের অত্যন্ত উঁচুদরের একটি দৃষ্টান্ত, মিঃ রাইডার হ্যাগার্ড লণ্ডনের 'সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চে' পাঠিয়ে ছিলেন। আমরা এখানে সেটিকে উদ্ধৃত করলাম ঃ

"১৯০৪ সালে ৭ই জুলাই-এর রাতের ঘটনা। মিসেস হ্যাগার্ডের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন তাঁর স্বামী মুখ দিয়ে একটা বিকৃত শব্দ করছেন, যেন কোন আহত জানোয়ার গোঙাচ্ছে। তিনি স্বামীকে ডেকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। ঘুম ভেঙ্গে যেতে মিঃ রাইডার তাঁর স্বপ্নের কথা স্ত্রীকে বিশদভাবে জানিয়েছিলেন। স্বপ্নটিতে স্পষ্টতই দুটি আলাদা অংশ আছে। প্রথমের দিকে মিঃ রাইডারের ভয়ঙ্কর একটা কষ্ট অনুভূত হয়েছিল যেন কেউ তাকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলাম চেষ্টা করছে। কিন্তু তার পর তাঁর স্ত্রীর গলার আওয়াজ কানে যেতে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে আসার সেই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্বপ্নটাকে খুব পরিষ্কার দেখতে পান। তিনি বললেন, "আমি আমাদের প্রিয় কুকুর ববকে একটা ডোবার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখলাম যেন। কুকুরটা তার মুখটা আমার দিকে একটু কোণাকুণি-ভাবে তুলে তাকিয়ে ছিল। আমি দেখলাম আমার অশরীরী আত্মাটা কুকুরের দেহ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বব আমাকে কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তার ঘেউ ঘেউ শব্দ থেকে কিছু বুঝতে পারছিলাম না বলে সে যেন বিচিত্র কোন উপায়ে আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে

দিল তার বক্তব্য, সে মারা যাচ্ছে। পরের দিন সকালবেলা ববের গলার বকলসটা রেলের ব্রিজের ধারে পাওয়া যায়, তাতে রক্তের দাগ এবং প্রায় চারদিন বাদে তার থেতলানো পা ভাঙ্গা দেহটা নদীর জলে ভাসতে দেখা গেল। ট্রেনের আঘাতে তার মাথার খুলিটা চূর্ণ হয়ে যায় এবং সে ব্রিজ থেকে ছিটকে জলে পড়ে যায়।"

আরো বিভিন্ন স্বাভাবিক ঘটনা থেকে জন্তুদের মধ্যে প্রখর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া গেছে। কোন দিন হয়তো এমনও প্রমাণিত হতে পারে যে মানুষদের থেকেও তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশী প্রখর। তবুও তাদের দিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা করানোর চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। কারণ পশুদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যতই প্রখর হোক না কেন সে ধরণের কাজ করা কোনদিন তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এধরণের ভবিষ্যৎবাণীর খেলা যারা দেখায় তাতে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কারোর কোন উপকার হতে পারে না। তারা উপকৃত, কারণ সেটাই তাদের জীবিকা।

প্রসঙ্গটা হয়তো বিতর্কমূলক কিন্তু পরামনোবিজ্ঞানীরা এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা দেখতে পাননি। তবে একথা মানতে কোন আপত্তি নেই যে উপরের দুই শ্রেণীর অর্থ রোজগারের ব্যবসাতে E. S P-র কোন যোগাযোগ না থাকলেও বহু সাধারণ সম্প্রদায়ের লোকেদের এই বিচিত্র মানসিক ক্ষমতা থাকতে পারে বা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে চাতুরীর মত মনে হলেও তারা সঠিক ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারে। E S P-র যতগুলি ধারা আছে তার মধ্যে 'ভবিষ্যৎবাণী করা' বোধহয় প্রাচীনতম অভ্যাস-বৃত্তি এবং কালান্তরিত হয়ে আজো তা টিঁকে আছে। যাঁরা এই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন তাঁদের আমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলি এবং তাঁদের এই পরাস্বাভাবিক ক্ষমতাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বলা যেতে পারে।

আট

পুনর্জন্ম, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব প্রভৃতি বিভিন্ন পরা-স্বাভাবিক ক্ষমতার যে সব উদাহরণ আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে পেয়েছি তা ছাড়াও কিছু কিছু বিচিত্র ঘটনার বিবরণ কিংবা আমাদের বিচিত্র অভ্যাস ও আচরণের উপরেও পরামনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে থাকেন। এ অধ্যায়ে তেমন কয়েকটি কাহিনী ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতাপত্র থেকে তুলে দিলাম। আমাদের এখানে উদ্ধৃত অপ্রাকৃত ঘটনাগুলি ছাড়াও আরো অনেক বিচিত্র কাহিনী হয়তো পাঠকদের জানা থাকতে পারে, সেগুলি সহৃদয় পাঠকেরা যদি প্রকাশকের ঠিকানায় লিখে জানান তাহলে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা কাজে যথেষ্ট উপকার হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলি মুদ্রিত করা সম্ভব হবে।

মানসপটে আলোকচিত্র

শিকাগো শহরের অখ্যাত অতিসাধারণ নাগরিক টেড সেরিওস ১৯৬২-তে হঠাৎ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠল। সারা বিশ্বের পরামনো-বিজ্ঞানীরা তাকে নিয়ে আলোচনায় মশগুল হলেন। এখনো পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে টেড সেরিওসই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের দিকে ক্যামেরার ফোকাস করে দূরদূরান্তরের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারে। প্রায় বারো বছর ধরে সে এই ধরণের 'মানসিক ছবি' বিভিন্ন ক্যামেরায় সাদা-কালো বা রঙিন ফিল্মে তুলে যাচ্ছে। মোশান ক্যামেরার সাহায্যেও সে একবার ছবি তুলেছে। নিজের দেহের দিকে ক্যামেরার লেন্স রেখে যে সব স্থানের ও দৃশ্যের ছবি সে তুলেছে সে সব জায়গায় এর আগে কোন দিন

সে যায়নি, কোনদিন তাদের ছবি দেখেনি এবং সে সব অঞ্চল সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা তার ছিল না।

আলোকচিত্র গ্রহণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'ভৌতিক ছায়াচিত্র' (Spirit Photography) ছবি তোলার শুরুর সময় থেকেই প্রায় চলে আসছে। অতিরিক্ত কোন মুখ বা দেহের অবয়ব অবর্ণনীয়ভাবে আলোকচিত্রে বহুকাল থেকেই আবিভূ'ত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়মকানুনের আওতায় ফেলে যখন কোন কিছুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না তখন তাকে আমরা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত। ভৌতিক ছায়া চিত্রের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। আধ্যাত্মিক মহলে তার স্বীকৃতি থাকলেও বিষয়টির বৈজ্ঞানিক যাচাই এখনও সফল হয়নি। অবশ্য ডার্করুমের সম্ভাব্য অঘটনের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে এ ধরণের ব্যাপারে কারচুপি করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু পোলারয়েড-ল্যাণ্ড ক্যামেরায়, যাতে করে সকলের চোখের সামনেই ফিল্মের নেগেটিভকে আলোকচিত্রে পরিস্ফুট করা চলে, সেখানে এই মানসিক ছায়াছবিগুলিকে এক কথায় আজগুবি বলে নাকচ করা চলে না। তাছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তির ক্যামেরা ও যাচাই করা ফিল্ম ব্যবহার করে সাধারণ কারচুপি ও চালাকি বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে।

ইলিনয়েস সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী পাওলিন ওহেলার ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার 'ফেট' (Fate) পত্রিকায় লিখেছিলেন—"এই কয়েক মাসের মধ্যে মিঃ সেরিওস মানসিক চিত্র গ্রহণের অনেকগুলি পরীক্ষা দিয়েছে। চিত্র গ্রহণের সময় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, আলোকচিত্র শিল্পী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের ব্যবহৃত পোলাবয়েড-ল্যাণ্ড ক্যামেরা সে ব্যবহার করে। চিত্র গ্রহণের সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সে প্রত্যেকবার সত্যিই 'ছবি' তুলতে পেরেছে, তার মধ্যে কোন চালাকি বা ধাপ্পাবাজি

ছিল না। তার ছবিগুলি নিঃসন্দেহে পরা-স্বাভাবিক (Para normrl)।"

বিজ্ঞানের পরীক্ষিত কোন নিয়মসূত্রে এই অলৌকিক বিষয়টি ব্যাখ্যা করা চলে না। সেরিওস নিজেও ব্যাখ্যা করার কোন রকম চেষ্টা করে না। অন্য আর পাঁচজনের মতই নিজের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতায় নিজে সে বিস্মিত।

সেরিওসের নিজের কথা মত তার এই মানসিক ক্ষমতার সূত্রপাত ১৯৫৩ অথবা ১৯৫৪ সালের কোন সময়ে হবে। সে সময়ে তার সহকর্মী বন্ধু জর্জ্জ জোহান্স তাকে সম্মোহিত করার প্রথম চেষ্টা করে। জোহান্স কিছুকাল আগে ফ্লোরিডায় থাকার সময় সম্মোহনের সাহায্যে স্পেনের অবলুপ্ত গুপ্তধন আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছিল। শিকাগোতে সেরিওসের মধ্যে সম্মোহনের প্রভাব বেশী কার্যকরী দেখে জোহান্সের গুপ্তধন লাভের বাসনা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। বন্ধুকেও এ ব্যাপারে সে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এর পরে অবসর পেলেই তারা দুজনে সম্মোহনের দ্বারা অতীত অবগাহনের (Hypnosis Regression) চেষ্টা করতো।

এই রকম এক বৈঠকে সেরিওস জানালো সে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল মানস-পটে দেখতে পাচ্ছে। জোহান্স প্রস্তাব করে সেই অঞ্চলের চিত্রগ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে কিনা। পরের বৈঠকে তারা একটা ক্যামেরা ধার করে যোগাড় করলো। প্রথম ফিল্ম-রোলের সব কটিতেই অজানা অঞ্চলের আলোকচিত্র দেখে তারা দুজনেই বেশ অবাক হয়। পরবর্তী ক'বছরে তারা এ ধরণের আরো অনেক মানসিক ছবি তুলেছিল। কিন্তু এই বিচিত্র ক্ষমতাকে অর্থকরী করার প্রচেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা ও ধর্মান্ধদের চাপে পড়ে তাদের সেই অসম সাহসিক পরিকল্পনায় ভাঁটা পড়ে। তখন তারা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তাদের এই ক্ষমতাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সম্মতি দেয়। আশ্চর্য কিছু করতে পারার ক্ষমতা তাদের স্বীকৃতি পায় না। আমেরিকান

সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ এবং ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিকরা রিপোর্টকে নিয়ে সামান্য নাড়াচড়ার পর আর কোন আগ্রহ দেখালেন না।

ফটোগুলি বন্ধ ঘরে ক্যামেরার লেন্সের সামনে বিভিন্ন সাধারণ গৃহস্থালী জিনিসের উপস্থিতিতেই তোলা হয়েছে একথা দাবী করায় সকলেই আজগুবি বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয় এবং কেউই ব্যাপক অনুসন্ধান করার কোন চেষ্টা দেখায় না।

এই হতাশা ও মানসিক অশান্তিতে দুজনের স্বাস্থ্যই ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৫৭ সালে শীতের সময় জোহান্স ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। সেরিওসও সে সময়ে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। জোহান্সের চিকিৎসক সম্মোহনের দ্বারা চিকিৎসা করায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সে সময়ে দুই রোগীকে সুস্থ করে তোলাই তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল। তাদের সেই মানসিক ছবি তোলার 'উন্মাদ দাবী' তিনি বিশ্বাস করেন নি। তিনি সেরিওসকে গভীর-ভাবে সম্মোহিত করে তার মনে কেবল এই বিশ্বাস প্রোথিত করে দিলেন যে সে বুকের মধ্যে জামার তলায় কোন ফটো লুকিয়ে রেখে বা জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যের ছবি তুলেছে কিনা। জোহান্সের চিকিৎসক সেই মানসিক ছায়াচিত্র গ্রহণের সত্যাসত্য বিচারের আর কোন চেষ্টা করলেন না। যাই হোক, তাঁর চিকিৎসায় ফললাভ হল। দুজনেই পুনরায় হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

এরপরে সেরিওসকে অতীতের কথা জিজ্ঞেস করলে সে সেই ডাক্তারের সম্মোহনে প্রভাবিত হয়ে বোকার মত হেসে জানাত যে সে আগে সকলকে প্রতারণা করেছে, ক্ষমাও চায় সকলের কাছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, সেই সম্মোহনের প্রভাবেই সে সমস্ত ছবিগুলি, প্রায় তিনশোর কিছু বেশী নষ্ট করে ফেলে দেয়।

কিন্তু ডাক্তারের আরোপিত বিশ্বাস মিথ্যা ছিল বলেই ক্রমশ তার প্রভাব সেরিওসের মন থেকে মুছে যেতে থাকে। সেরিওসের আবার পুরোনো বিশ্বাস ফিরে আসে যে সে কোন রকম প্রবঞ্চনা না।

করেই ছবিগুলি তুলেছিল! তখন সে আবার তার হৃত ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করে। ইন্টারন্যাশনাল গিল্ড অব হিপনোটিষ্টের সভাপতি মিঃ ষ্টানলে মিচেলের অনুপ্রেরণায় সেরিওস অবার তার আগের ক্ষমতা ফিরে পায়। কয়েকটা 'ব্যর্থ সাদা ছবি' তোলার পর ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার নবপর্যায়ের মানসিক আলোকচিত্রের প্রথম ছবি ফুটে উঠলো, শিকাগো আভেন্যুর বিখ্যাত ওয়াটার টাপয়ার।

১৯১৫-র জানুযারীতে সেরিওস ভারতবর্ষের একটা মানচিত্র দেখে। এবং তারপরেই সে ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়ের বেশ কিছু ছবি তুলে ফেলে। চিত্রগুলির মধ্যে প্রথম ছিল তাজমহল। সেই দিনই সে খুপরিওলা গম্বুজের ছবি তোলে। ঐ ধরনের গম্বুজ তাজমহলে নেই। জানুয়ারীর ৭ তারিখে 'ভারতের' আরো তিনটি ছবি সে নেয়। তারপর মার্চের ৩ তারিখে দুটি এবং মার্চের ১৯ তারিখে একটি ছবি তোলে। তাজমহল ছাড়া অন্য ছবিগুলোকে তৎক্ষনাৎ সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরে ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক অঞ্চলের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলি সনাক্ত করা হয়। ছবিগুলি ফতেপুর সিক্রির মজজিদের প্রধান ফটক, বলন্দ দরয়াজা, দিল্লীর লালকেল্লার সদর হলঘর ইত্যাদি।

"একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত," পাওলিন ওহেলার জানালেন, "সেরিওস আসল ছবিগুলি কখনই দেখেনি। তবুও এর পরে বিভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধান করে দেখতে চেষ্টা করা হয় যে সেরিওস ছবির বিষয়গুলি সম্পর্কে আগের থেকে কোন জ্ঞান অর্জন করেছিল কিনা।"

সেরিওস পড়াশোনা খুব বেশী করেনি এবং শিকাগোতে তার সঙ্গ ও পরিবেশ থেকে ধারণা করতে অসুবিধে হয় না যে দেশবিদেশ সম্পর্কে তার জ্ঞান খুব সামান্য।

শ্রীমতী পাওলিন ওহেলার আরও জানালেন, "আমি ব্যক্তিগত-ভাবে সেরিওসকে প্রথম ছবি তুলতে দেখেছিলাম উইলমেট শহরে

আমার নিজের বাড়ীতে ১৯১৫ সালের ২১শে মে। সে সময়ে আমার স্বামী, বারো ও ষোল বছরের আমার দুই মেয়ে এবং ইলিনয়েস সোসাইটি ফর সাইকিক্ রিসার্চের সেক্রেটারী মিঃ টেচার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যে পোলারয়েড ল্যাণ্ড ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয় সেটি আমি তিন বছর আগে যে দোকান থেকে কিনেছিলাম তাদের কাছে সেদিন দুপুরে পরীক্ষা করিয়ে নিই। দ্বিতীয় আর একজন সাক্ষীর সামনে ক্যামেরাটি ভাল করে পরীক্ষা করার পর দোকানের কর্মচারী একটি ফিল্মের রোল নিজে সই করে ক্যামেরায় ভর্তি করে ক্যামেরাটি গালা দিয়ে সীল করে দেয়। আমার ফাইলে সেই সাক্ষীর এবং দোকানের কর্মচারীটির লিখিত জবানবন্দী রাখা আছে। মিঃ টেচার ও বাড়ীর অন্য সভ্যেরা ক্যামেরাটি পরীক্ষা করার পর সেটি সেরিওসের হাতে দেওয়া হল। প্রথম ছবিটি তোলামাত্রই তাকে পরীক্ষা করার জন্য জামা খুলে ফেলতে অনুরোধ করা হয়। সে বিনা দ্বিধায় তার গেঞ্জি পর্যন্ত খুলে ফেলে আমাদের পরীক্ষা করতে দিয়েছিল। এখানে বলা বাহুল্য ক্যামেরাটি সে বুকের দিকে ফোকাস করে ছবি তুলেছিল। ঘরটিকে আলোকিত করার জন্য তিনটি ১৫০ ওয়াটের আলো এবং তিনটি টেবিল ল্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল। টেবিল ল্যাম্পের মধ্যে দুটি মিঃ সেরিওসের চেয়ারের দু' ধারে রাখা হয়। ঘরের আলো কোন সময়েই নেবানো হয় নি। প্রত্যেকটি ছবি তোলার সময় ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করা হয়েছিল।

"সেরিওস ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। ছবি তোলার সময় তার হাতে জপের মালাটা ধরা থাকতো। এর কোন কারণ সে নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আবার কোন কোন সময় সঙ্গে একটা পিচবোর্ডের ফাঁপা নল রাখতো। নলটি সাত আট ইঞ্চি লম্বা এবং পরিধিতে তিন চার ইঞ্চি। এটাও তার একটা খেয়াল। আবার বাড়ীতে ছবি তোলার সময় নলটি আগাগোড়া স্বচ্ছ সেলোটেপ দিয়ে মোড়া ছিল। কারণ হিসেবে সে বলে পাছে কেউ সন্দেহ করে যে

সে কোন মাইক্রো ফিল্ম তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। এই সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, কারণ ক্যামেরার লেন্সের অত কাছে রেখে কোন বস্তুর ছবি তোলা সম্ভব হয় না। তবুও প্রতিটি ছবি তোলার আগে ও পরে চোঙাটি পরীক্ষা করা হয় এবং আরো বিশদ নিরীক্ষণের জন্যে সেটি আমার কাছে জমা রেখে দিই।

"চেয়ারে আমাদের দিকে মুখ করে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে সে ক্যামেরা চেপে ধরে। বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলে ধরে নলটি লেন্সের উপর রাখে, ডান হাতে জপের মালা এবং ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শাটার টেপে ক্যামেরার। প্রত্যেকবার ছবি তোলার পর আমি নিয়মমত ছবির প্রিন্ট ক্যামেরা থেকে বার করে নিয়েছিলাম। (পোলারয়েড-ল্যাণ্ড ক্যামেরায় ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই নেগেটিভ থেকে পজিটিভ প্রিন্টকটো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্যামেরা থেকে বেরিয়ে আসে। ফিল্ম ডেভেলপমেণ্টের জন্য ষ্টুডিওতে দিতে হয় না।)

সেরিয়স শ্রীমতী ওহেলারের বাড়ীতে সব শুদ্ধ দশটি ছবি তোলে। প্রত্যেকটি ছবির বিভিন্ন বিষয়। শ্রীমতী ওহেলার তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে বলেন, "সমস্ত কিছু নিজের চোখের সামনে দেখার পর স্বীকার করতেই হয় যে ছবিগুলি পরা-স্বাভাবিক উপায়ে গৃহীত।"

কিন্তু তবুও চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হবার জন্য পাওলিন ওহেলার পোলারয়েড কর্পোরেশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ স্টানফোর্ড ক্যালডারউডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ক্যালডারউড ঘটনাটি আনুপূর্বিক শোনার পর বললেন—"যদিও কোন কোন সুচতুর ব্যক্তির পক্ষে আগে থেকে আমাদের ফিল্মে কিছু কারচুপি করা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু একটা কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি অন্যের সামনে দোকান থেকে ফিল্ম কিনে ক্যামেরায় লাগানোর পর কোন কিছু করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ফিল্মে কায়দা করাটাও খুব জটিল ও সময় সাপেক্ষ এবং যেখানে ক্যামেরায় এক সঙ্গে অনেকগুলি ফিল্ম লোড করে পর পর দৃশ্যের ছবি (অথবা চিন্তাধারার!) তোলা হয় সেখানে দৃশ্যপট নিজের খুশি মত পরিবর্তিত করার বাস্তব ক্ষেত্রে

সম্ভাবনা নেই।" এর থেকে বুঝতে পারা যায় শ্রীমতী ওহেলার আগে থেকেই যথেষ্ট সাবধান ছিলেন এবং চালাকির সম্ভাব্য রাস্তাঘাট বন্ধ করেছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে সেরিওসের পরাস্বাভাবিক ঘটনার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখা গেছে ক্যামেরার শাটার' টেপার পর কিসের ছবি ক্যামেরা থেকে বেরোবে সেরিওস সে সম্পর্কে আগে থেকে প্রায়ই বলতে পারতো না। যখনই সে ছবির বিষয়বস্তু আগাম জানাবার চেষ্টা করতো দেখা যেত তার ধারণা ভুল হচ্ছে। কিন্তু তার ছবিগুলি প্রতিক্ষেত্রেই মানব-মস্তিষ্কের সৃজন-পদ্ধতির বিচিত্র ধারা প্রকাশিত করেছে। সেরিওসের এই মানসপটে আলোকচিত্রের (Psychic Photography) বৈজ্ঞানিক সূত্র আজও আবিষ্কার করা যায়নি। কিন্তু বিষয়টিকে ১৯৫৪-৫৫ সালের মত বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার দরকার।

মানসিক আলোকচিত্র গ্রহণের এই ঘটনা সাইকোকিনেসিস (Psychokinesis) পর্যায়ের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি শারীরিক শক্তি অথবা যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে বহির্জগতের কোন বস্তুর উপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আরোপ করতে পারে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বিদেশ ভ্রমণকালে শিকাগো শহরে কিছুকাল ছিলেন। তিনি এই বিচিত্র বিষয়টির তথ্য ও ছবিগুলি সংগ্রহ করেন।

* * *

চোখের বাইরে দেখা (Eyeless Vision)

আমরা যাকিছু দেখি অথবা দেখতে পাই তার জন্য আমরা চোখের কাছে ঋণী। কোন কারণে এই ইন্দ্রিয়টি যদি কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে এত আলো নিয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

আমাদের কাছে নিবিড় অন্ধকার হয়ে যাবে। চোখকে তাই অনেকেই এই কারণে রত্ন বলে থাকেন।

অথচ বিচিত্র এ পৃথিবীতে এমন কিছু লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা এই দেখার কাজটা চোখের সাহায্য না নিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশের সাহায্যে করে থাকে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ১৫০ বছর আগের খবরে এ রকম আঙ্গুল দিয়ে দেখার কথা জানা গেছে।

Eucychopedia of the Cccult-তে 'পেট দিয়ে দেখার' একটা বিবরণ আছে। এক বিশেষ শাখার সম্মোহন বিদ্যার(Anton Mesmar) চর্চা করেন এমন কিছু লোক অচৈতন্য অবস্থার সব কিছু দেখতে পায়। যে জিনিস তারা আগে কখনও দেখেনি এমন বস্তু কাপড়ে ঢাকা দিয়ে তাদের পেটের উপরে রাখলে তারা বলে দিতে পারে জিনিসটা কি। পরামনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন পাশবিক সম্মোহনের (Animal Magnehism) জন্যেই এমন নাকি সম্ভব হয়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রফেসার ফনটান নামে জনৈক বিজ্ঞানী এক ফরাসী নাবিককে পরীক্ষার কথা জানান। জন্ম থেকেই সেই নাবিকটি মৃগী রোগে ভোগার জন্য তার চোখের দৃষ্টি খুবই খারাপ ছিল। সম্মোহিত অবস্থাতে সে জানায় যে আঙ্গুল দিয়ে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। চোখে কালো কাপড় পুরু করে বেঁধে তার সামনে কিছু ছাপা কাগজ-পত্র, রঙীন কাপড়ের টুকরো ও কয়েকটা ফটো ধরা হলে সে ঠিক ঠিক বলে দেয়। আলো অথবা অন্ধকার যে কোন অবস্থাতেই সে আঙ্গুলের সাহায্যে দেখতে পেত।

ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটাকে মেনে নিয়েছেন। তারা এধরনের দেখাকে 'চক্ষুহীন দৃষ্টিপাত' অথবা 'চোখের বাইরে দেখা' বলে থাকেন।

অন্যান্য গবেষণার ইতিহাস থেকে জানা যায় স্কটল্যাণ্ডের একটি অন্ধ স্কুলের ছাত্র, কানাডার একটি মেয়ে, জনৈক 'মিডিয়াম' (প্লানচেট

অথবা সম্মোহিত অবস্থায় যাদের উপর আত্মা ভর করে) তাদের কনুইয়ের সাহায্যে পরিষ্কার পড়তে পারতো। উনিশ শতকের শেষের দিকে রাশিয়াতে ডাঃ কোভরিন একজনকে পরীক্ষা করেছিলেন, যে চোখ বাঁধা অবস্থায় শুধু আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে কাগজের অথবা কাপড়ের রঙ চেনা, বন্ধ করা খামের ভেতরে রাখা ছাপা কাগজের লেখা পড়া অথবা কাঁচের শিশিতে তরল পদার্থের পরিমাণ কতটা আর তার কি রং তা বলে দিতে পারতো। পরীক্ষার সময় কোনবার ভুল হয়নি।

ফরাসী ঔপন্যাসিক ও কবি জুলে রোঁমা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই চোখের বাইরে দেখা ঘটনাগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শরীরের বিভিন্ন স্থানে ত্বকের সঙ্গে ক্ষুদ্র (Microscopic) কিছু চোখ ছাড়িয়ে থাকে বলেই এমনটি ঘটে। তিনি এই চোখগুলিকে 'অণু অক্ষি' বলতেন এবং প্রাণী জগতের বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে যখন দেখা কাজটা চোখের একচেটিয়া হয়নি তখন ত্বকের সাহায্যে যে আমরা দেখতে পেতাম এই ঘটনাগুলি তার অবলুপ্তপ্রায় প্রমাণ বলে মনে করতেন।

রোঁমা তাঁর পরীক্ষা-প্রতিনিধিদের (Subjects) সম্মোহিত করে চোখ বেঁধে দিতেন। তাদের সেই অচৈতন্য অবস্থায় শরীরের যে কোন স্থান দিয়ে 'দেখা'র চেষ্টা করতে উৎসাহিত করতেন। বড় বড় টাইপে ছাপা কাগজের উপর তাদের আলতোভাবে আঙ্গুল বুলিয়ে অক্ষরগুলি পড়তে বলতেন। ক্রমশ তাদের অনুভূতির উন্নতি হয় এবং তারা ছাপা হরফের উপরে আতশ কাচ রেখে পড়তে পারতো।

তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন আঙ্গুল ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়েও এভাবে দেখা যায়, আবছা অন্ধকারে কিছু কিছু রঙ চিনে ফেলা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকারে কিছুই বলা সম্ভব নয়—তা সে রঙ, লেখা অথবা সংখ্যাবাচক অক্ষর যাই হোক না কেন। এই সব যুক্তি দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে চোখের উপর

আলোর যে প্রতিক্রিয়া হয় ত্বকের উপরেও সেই একই প্রভাব দেখা যায়।

তবে তিনি এগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক (Psychic) কোন কারণ বলে মনে করতেন না। তখনকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা তাঁর যুক্তি ও এই গবেষণার কোন মূল্য দেননি, তাঁরা বিশ্বাস করতেন জুলে রোঁমা তার সাবজেক্টদের ঠিকমত চোখের উপর কাপড় বাঁধতে পারতেন না বলেই ফাঁকফোকর দিয়ে ওরা দেখে ফেলতো।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানী এ. এন্ লেনচিয়েভ তার সাবজেক্টদের হাতের অতি সূক্ষ্মভাবে লাল ও সবুজ আলোক রশ্মি ফেলে তা আলাদাভাবে চেনাতে পেরেছিলেন।

'চোখের বাইরে দেখা' নিয়ে রীতিমত হৈ-চৈ হয় ১৯৬২ সালে রোজা কুলেশেতোর ঘটনা কাগজে প্রকাশিত হবার পর থেকেই। শ্রীমতী রোজা কুলেশোভা এখন প্রখ্যাত রুশদেশী সাবজেক্ট। অন্ধ লোকেদের সঙ্গে কিছু কিছু কাজ করার সময় তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর ডান হাতের তৃতীয় ও চতুর্থ আঙ্গুলের সাহায্যে 'দেখে তিনি পরিষ্কার যে কোন ছাপা কাগজ পড়তে পারেন। শ্রীমতী কুলেশোভাকে প্রথমে তাঁর গৃহ চিকিৎসক পরীক্ষা করেন এবং পরে নিজনি টাজিল পেডাগোজিকাল ইনষ্টিটিউটে ও নিউরাল-জিকাল ইনষ্টিটিউট অব মস্কো বিভিন্নভাবে খুঁটিয়ে দেখে।

তিনি ছাপা বই থেকে অনায়াসে পড়তে, বিভিন্ন রঙের জিনিস চিনতে, ডাক টিকিটের উপরে ছবির বর্ণনা অথবা একহারা বিভিন্ন রঙীন সুতো আলাদা করে সহজেই বলে দিতে পেরেছিলেন। এই পরীক্ষার সময় তাঁর চোখ দুটি খুব ভালভাবে বেঁধে মুখের সামনে অস্বচ্ছ কালো পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ইনষ্টিটিউটের রিপোর্টে শ্রীমতী কুলেশোভার বাঁ হাতের তর্জনী, ডান পায়ের পাতা এবং জিবের ডগা দিয়েও দেখতে পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রায় দু সেন্টিমেটারের মত পুরু কাচের তলায় রাখা বইয়ের ছাপা লেখা তিনি পড়তে পারতেন।

সোভিয়েত দেশের আর একটি সাবজেক্ট অন্ধ-তরুণী নাদিয়া লোবানোভা। এক গোছা রঙীন কাগজের রঙ আলাদা করে বলা অথবা লোহার পাতের তলায় চাপা দেওয়া জিনিসের রঙ কিংবা কোন শিল্পীর আঁকা ছবির প্রধান রঙটি কি তা হাত বুলিয়ে দেখে বলে দিতে পারতো। এই দেশেরই তিন নম্বর সাবজেক্ট কুমারী লীনা ব্লিৎনোভা আট বছর বয়সেই বুঝতে পারে যে সে হাতের তালু, কনুই ও চিবুক দিয়ে দেখে দু তিন গজ দূরে রাখা ছবির সবকিছু হুবহু দেখতে পাচ্ছে। মোটা মোটা বই চাপা দিয়ে রাখা ফটো কিংবা চিঠি প্রভৃতিতে হাত বুলিয়ে বেমালুম সেগুলোর বর্ণনা দিতে পারতো।

আমেরিকার অন্যতম সাবজেক্ট শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া স্টানলে। নিউইয়র্ক বার্নাড কলেজের মনোবিজ্ঞানের প্রফেসার ডাঃ রিচার্ড ইয়ুজ তাঁকে পরীক্ষা করে জানালেন শ্রীমতী ষ্টানলে আলোতে এবং বিশেষ করে প্রায় অন্ধকারে বিভিন্ন রঙ সঠিকভাবে বলতে পারেন। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ পরীক্ষায় সফল হন। ম্যাসাচুস্টেসের এক অল্প বয়সের মেয়ের সম্মোহিত অবস্থায় ত্বকের সাহায্যে দেখতে পাওয়ার খবর কাগজে জানা যায়। সম্মোহন করার পর তার সারা মুখে একটা কালো মুখোস পরিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এই ঘটনার বিজ্ঞান সম্মত কোন পরীক্ষার বিবরণ রাখা হয়েছে বলে জানা যায় নি।

শ্রীমতী কুলেশোভার হাতের আঙ্গুল দিযে দেখার এই বিচিত্র ঘটনাকে নিজ্নি টাজিল কলেজের অধ্যাপক এ. এস নভোমিয়োস্কি স্পর্শানুভবের ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কারণ, পরীক্ষা করে দেখা গেছে কুলেশোভা অথবা অন্য সাবজেক্টের সকলেরই এক এক ধরণের রঙের ক্ষেত্রে এক এক ধরণের স্পর্শ-সচেতনতা রয়েছে। যেমন কেউ লাল রঙের জিনিসে হাত দিলে ঢেউ তোলা রেখায় হাত দেওয়ার অনুভূতি পায়, সবুজের ক্ষেত্রে বিন্দু অথবা হলদের ক্ষেত্রে চিকে কাটা রেখা স্পর্শের অভিজ্ঞতা অনুভব করে। কিন্তু এই

ব্যাখ্যাকে নাকচ করে দিতে হল। কারণ, দেখা গেছে রঙীন জিনিসের উপর স্বচ্ছ কাঁচ চাপা দিলে সাবজেক্টরা জিনিসটার উপর সোজাসুজি হাত না দিয়ে কাঁচের উপরে হাত বুলিয়েও সঠিক জবাব দিতে পারে।

ডাঃ ইয়ুজ, মনোবিজ্ঞানী পি. বি. নোভলস্কি এবং লেনিনগ্রাড বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক বোরিস কনস্টানটিজভ ঘোষণা করলেন যে তাপের বিকিরণ (Heat Radiation) সূত্রের জন্য এমন হচ্ছে। তাঁদের মতে সাবজেক্ট যখন কোন রঙীন জিনিসে হাত দেয় তখন তার আঙ্গুলের উত্তাপ থেকে বিচ্ছুরিত প্রচ্ছন্ন-লোহিতরশ্মি (Infra-red Rays) জিনিসটির গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক রঙের প্রতিফলনে আলাদা আলাদা তরঙ্গের উৎপত্তি হবে এবং সাবজেক্ট তার অভিজ্ঞতা থেকে সেই তরঙ্গের হেরফের মত রঙের সঠিক চেহারা বলে দিতে পারে।

স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রামতী স্টানলি প্রায় শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে সফল হতেন কিন্তু তাঁর হাতে বরফের টুকরো রাখলে বা জলের মধ্যে বস্তুটি রেখে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে মাত্র শতকরা চল্লিশটি ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারছেন। তিনি সাধারণত আর্দ্র ও উষ্ণ কামরায় বেশী ভাল নির্ণয় করতে পারতেন—সাধারণত এই রকম আবহাওয়ায় প্রচ্ছন্ন-লোহিত রশ্মির প্রতি ফলন ভাল হয়।

কিন্তু শ্রীমতী কুলেশোভাকে একটি বিশেষ পরীক্ষায় প্রচ্ছন্ন-লোহিত রশ্মির ক্ষমতা নষ্ট হয় এমন ফিলটার লাগিয়ে পর্দার গায়ে প্রতিফলিত বর্ণালী (Spectrum) থেকে রঙ চিনতে বলায় তিনি প্রত্যেকটি রঙ নির্ভুল বলে দেন। এছাড়া অন্য অনেক সাবজেক্ট স্পর্শ না করে দূর থেকেই দৃশ্য বস্তুটি বলে দিতে পারায় তাপের বিকিরণ ব্যাখ্যাটি নাকচ হয়ে যায়।

সব থেকে বেশী প্রচলিত ব্যাখ্যা হল চোখের রেটিনার মতই ত্বকেরও আলোক প্রতিবিম্ব গ্রহণ বা ধারণের ক্ষমতা আছে। এই যুক্তির পক্ষে জোরদার সর্ত হল সাবজেক্টরা নিবিড় ছায়ায় অথবা

অন্ধকারে ঠিকমত উত্তর দিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা, যাঁরা এই ব্যাখ্যাটি বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে দেহের বিভিন্ন অংশের এই আলোক প্রতিবিম্ব ধারণের ক্ষমতা হয়তো বিবর্তনের ধারার (**Evolutionary Stage**) ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেছে।

শ্রীমতী কুলেশোভাকে আরো পরীক্ষা করে এই মতের সপক্ষে যুক্তি পাওযা গেল। টাইপরাইটার মেশিনে রিবন না লাগিয়ে খুব জোরে চাবিতে আঘাত করে দাগ কেটে কেটে কাগজে টাইপ করে তাকে পডতে দিলে তিনি ঠিক ঠিক বলতে পারেন না। কিন্তু মেশিনে রিবন লাগিয়ে খুব আলতো ছোঁযায় টাইপ পড়তে বললে ঠিক ঠিক বলতে পারেন। আরো একটি পরীক্ষায় আলোর প্রতিবিম্বিত বিচ্ছুরণে কুলেশোভাকে নিরীক্ষণ করে দেখা গেল একটি সবুজ রঙের জিনিসের উপর লাল আলো ফেলাতে তার রঙ যখন নীল মনে হতে লাগল তখন তিনি ঠিক সেই মতই বললেন। আবার লাল আলো সরিয়ে নিতে জিনিসটিকে সবুজ বলে ঘোষণা করলেন।

তবে এই মতের বিরুদ্ধেও কিছু দৃষ্টান্ত আছে। অনেক সাবজেক্ট গভীর অন্ধকার ঘরে যেখানে স্বাভাবিক চোখে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রেও জিনিসপত্র সঠিক চিনে ফেলতে বা পড়তে পেরেছে।

অধ্যাপক নোভোমিয়েস্কি তাঁর পূর্বে বর্ণিত 'স্পর্শানুভূতির' মতবাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে জানালেন যে এই ব্যাপারটা 'স্পর্শ করে দেখা' (Dermal-Optic Sense)। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এক প্রবন্ধে তিনি বিশদ ভাবে বোঝালেন যে বিভিন্ন রঙের জিনিসে হাত দিয়ে বিভিন্ন অনুভূতি বিদ্যুৎ কম্পনের (**Electrical Vibrations**) জন্যই হয়ে থাকে। সে সময়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশ জনকে পরীক্ষা করে দেখালেন যে তারা সকলেই পাঁচটা থেকে সাতটা রঙকে ঠিকমত চিনতে পারছে। অধ্যাপকের মতে কোন রঙীন জিনিসে আলো এসে পড়লে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হন এবং এই বিদ্যুৎ সঞ্চালন বিভিন্ন রঙের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পনের সৃষ্টি করে।

এই কম্পন সাবজেক্টের দেহত্বকের বিদ্যুৎ তরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক বিশেষ অনুভূতির জন্ম দেয়। কাঁচ দিয়ে বস্তুটিকে চাপা দিলেও এই নিয়ম কাজ করবে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার পরামনোবিজ্ঞানী মিলান রাইল এবং লেনিনগ্রাড সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এল. এল. ভ্যাসিলিয়েভ এই সব বিদ্যুৎ কম্পনের কারণ বাতিল করে ঘোষণা করলেন ব্যাপারটা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জন্য (Extra Sensory Perceptio) সম্ভব হয়। মিঃ রাইল অনেক সাবজেক্টকে সম্মোহিত করে দেখেছেন তারা পূর্বে বর্ণিত সমস্ত ক্ষমতার (E.S.P-র) অধিকারী এবং সঠিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। তাঁর এই সাবজেক্টরা আলোর প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হতে পারে না এমন খামের মধ্যে রেখে দেওয়া 'জেনার কাড' খামটি শুধুমাত্র স্পর্শ করে ঠিকমত চিনতে পেরেছে। তিনি সাবজেক্টদের সম্মোহিত করে ডালাবন্ধ ঘড়ির উপর হাত বুলিয়ে সময় নির্ণয় করতে শিখিয়ে ছিলেন।

অধ্যাপক ভ্যাসিলিয়েভ অবশ্য মুক্তকণ্ঠে কোন কিছু কারণ ঘোষণা করতে পারেননি। তাঁর মতে চোখের বাইরে দেখার প্রকৃত কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বলে কোনটি আসল তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শন (Clairvoyance) অথবা মনোবিজ্ঞানের দু'তিনটি কারণের যৌথ মিলনে এভাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

কিছু কিছু অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিকদের প্রাথমিক ধারণা ছিল এর মধ্যে টেলিপ্যাথির কোন হাত থাকতে পারে না। কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অবশ্য 'টেলিপ্যাথির' সম্ভাবনাকে সরাসরি নাকচ করতে পারেন নি। সমালোচনা যাই হোক না কেন এক্ষেত্রে টেলিপ্যাথি বা ক্লেয়ারভয়েন্সকে একেবারে বাতিল করা চলে না! বিরুদ্ধ মতবাদীরা বলতে পারেন ক্লেয়ারভয়েন্স কারণ হলে অনুভাবীর আলো অন্ধকার কিংবা মৃদু উত্তাপ বা হাতে বরফ ইত্যাদি সব অবস্থাতেই এক ফল পাওয়া উচিত। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে

পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই বিবিধ ধারা বা প্রস্তুতি তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, কেননা এইসব বাস্তববাদী পরীক্ষা পরামনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এই সব অবস্থা তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শনের ক্ষমতাকে প্রতিহত করে এবং তাতে অনুভাবী ভুল করতে পারে।

বিনা চোখে দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এক, এই দেখতে পাওয়ার দাবী প্রকৃত অথবা গোঁজামিল? দুই, সত্য বা স্বাভাবিক বলে কেমন করে এটা ঘটে? তিন, বিষয়টি মনোবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে কিনা? অর্থাৎ এটা সাধারণ শারীরতত্ত্বের নিয়মাধীন কিংবা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের কার্যকলাপ?

এ বিষয়ে যাঁরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা সকলেই এই বিনা চোখে দেখাকে গোঁজামিল বলে উড়িয়ে না দিয়ে স্বাভাবিক ধরে নিয়েছেন। রাশিয়ার বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার লেখক লেভ টেপলভ কিন্তু নিতান্তই কঠোর সমালোচক। ত্বকের সাহায্যে অথবা আঙ্গুল দিয়ে দেখতে পাওয়াকে তিনি 'মৃগী' রোগের কারণ বলেছেন। তাঁর মতে সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন হয় সাবজেক্টরা গবেষকের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেযে যায় অথবা চোখ বাঁধা থাকলেও তলা দিয়ে দেখতে পায় এবং যারা অন্ধ বলে পরিচয় দেয় তারা হয়তো পুরোপুরি অন্ধ নয়।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় একটি ছোট্ট প্রবন্ধে দেখা গেল যে তারা রাশিযার কিছু সংবাদের ভিত্তিতে লিখেছে যে 'চোখের বাইরে' দেখার ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যে কারণ সাবজেক্টরা চোখে বাঁধা কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেখতে পায় এবং পুরোপুরি চোখ বেঁধে দিলেও সর্বদাই কিছুটা দেখা যায়।

আঙুল দিয়ে দেখতে পাওয়ার ব্যাপারও নাকচ করে দেন কেউ কেউ। কারণ অধিকাংশ সাবজেক্টরাই, শ্রীমতী কুলেশোভা শুদ্ধ, 'মৃগী রোগে আক্রান্ত। কিন্তু এসব তথ্য সত্য হলেও এতদিনের প্রত্যক্ষ

মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আর ত্বকের সাহায্যে দেখার সঙ্গে মৃগী রোগের কোন যোগসূত্র থাকলে সেটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করা উচিত।

তিন নম্বর বিতর্কের প্রসঙ্গে অর্থাৎ এটি পরামনোবিজ্ঞানের অধীনে নিয়ন্ত্রিত কিনা জানার জন্য অধ্যাপক ভ্যাসিলিয়েভ ১৯১৫ সালের ১৬ই জুন সর্বসাধারণের কাছে কুমারী নিনা কুলজিনকে নিয়ে কিছু E.S.P উদাহরণ দিলেন। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে পত্রিকা থেকে পড়তে পারে এবং কালো খামের মধ্যে রাখা বিভিন্ন জিনিস বলতে পারে। যারা এই সব জিনিসের পরীক্ষা পরিচালনা করছিলেন তাদের না জানিয়ে খামে রাখা হয়েছিল। কালো খামের মধ্যে জিনিস রেখে পরীক্ষা করা আর অন্ধকারে দেখা প্রায় সমপর্যায়ের এবং এটিকে E.S.P'র বলিষ্ঠ উদাহরণ বলা চলে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার পরামনোবিজ্ঞানী মিলন রাইল সোবিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণের সময় দেখলেন রাশিয়ার বিজ্ঞানবিদ্‌রা এই আঙ্গুল দিয়ে দেখার সঙ্গে পরামনোবিদ্যার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে তা স্বীকার করতে নারাজ এবং সে কারণেই এই ঘটনার কারণ হিসেবে পদার্থ বা শরীর বিজ্ঞানের সংজ্ঞার বহু সূত্র নিয়ে সেখানে মতবিরোধ চলছে। কিন্তু তিনি E.S.R.'র সংজ্ঞাকেই প্রাধান্য দেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানিদের সমালোচনা করে তিনি জানান যে তাঁরা সাবজেক্টকে পরীক্ষা করার বিভির খুঁটিনাটি তথ্য পরীক্ষার পদ্ধতি, তার সত্যতা এবং পরীক্ষা সম্পর্কে নিজেদের গবেষণা-। মূলক মতামত বিশদভাবে প্রকাশ করেন নি। তাই অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। রাইল জানান এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলে বিশ্বের বিজ্ঞান মহল আরো সহজে ঘটনাটিকে পরামনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে মানতে পারতেন।

১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে পরামনোবিজ্ঞানের মাসিক মুখপত্রে রোজা কুলেশোভাকে নিয়ে আরো ব্যাপক পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই সব পরীক্ষায় কাচ, পর্দা প্রভৃতি ব্যবহার করে

স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পাবার সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা হয়। শ্রীমতী কুলেশোভা সেসব ক্ষেত্রেও উত্তীর্ণ হয়ে E.S.P.'র সূত্রকেই জোরাল করে তোলেন।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'চোখের বাইরে দেখা' টেলিপ্যাথি (অপরের চিন্তাপঠন) ও ক্লেয়ারভয়েন্সের (তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ-দর্শন) যুগ্ম ফলশ্রুতি। বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতির অর্থনৈতিক পর্যায়ের নানান লোককে পরীক্ষা করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এর মধ্যে কোন জাল জোচ্চুরি বা মিথ্যে কারসাজি নেই। প্রাকৃতিক অন্যান্য নিয়মের মত 'চোখের বাইরে দেখাকে' পরীক্ষা করে দেখানো যায়। তবে তিনি ত্বকের সাহায্যে বা বিদ্যুৎ তরঙ্গের কম্পনের সংজ্ঞাগুলো পুরোপুরি বাতিল করে দেননা। তাঁর মনে হয় যে একাধিক শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার যুক্ত কারণ থেকে এই অবস্থার জন্ম হয়। ব্যাখ্যা করা এই মুহূর্তে সম্ভব না হলেও এর পরামনোস্তাত্ত্বিক দিকটাকে উপেক্ষা করা যায় না। এবং এ নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন আছে।

* * *

বিশ্বাস ও প্রার্থনার সাহায্যে রোগ-মুক্তি

উনিশশো পয়সট্টি সালের জানুয়ারীতে আমি (নাম গোপন রাখা হয়েছে) দুরারোগ্য ক্যানসার-এ আক্রান্ত হই। আমার মাথার খুলিতে তিনবার জটিল অপারেশন করে মস্তিষ্কের কাছে থেকে একটি টিউমার কেটে বাদ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা 'যে রাত্রে আমি মরে গিয়েছিলাম,' উনিশশো ছেষট্টি সালের মার্চ সংখ্যা Fate মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আগের এই অপারেশনের ঘা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর ডাক্তারেরা নিশ্চিত হয়ে আর একবার অপারেশন করে করে মাথার খুলির যে অংশটা আগে টিউমারটি অপসারণ করার সময় বাদ দিতে হয়েছিল তা জুড়ে দেবার জন্য তৈরী হতে থাকেন। আমি নূতন

অস্ত্রোপচারের জন্য বেশ ভীত হয়ে পড়ি। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দেন এবং মানসিক শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রার্থনা করতে বলেন। অল্প কিছুদিন পরে ছেলেমেয়েদের প্রতিবেশীর কাছে রেখে আমি আবার হাসপাতালে ভর্তি হলাম।

আবার মাথার খুলির সঙ্গে প্লাষ্টিকের টুকরো তার দিয়ে বেঁধে দেওয়ার অস্ত্রোপচার প্রায় চার ঘণ্টা ধরে করা হয় এবং তা সফল হয়েছে বলেই ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন। এখন কেবল ঘা শুকিয়ে আসার জন্য হাসপাতালে অপেক্ষা করা। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে আমার শরীর এখন প্লাষ্টিকের টুকরোটি গ্রমণ করতে রাজী নয় দেখা গেল, সেলাইয়ের চার পাশে বার বার পুঁজ জমে উঠতে লাগল। আমি অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ভুগতে লাগলাম। ছুঁচ ফুটিয়ে (Horse Needle) সেই পুঁজ বার করে দেবার পর আমি যন্ত্রণার হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পেলাম বটে কিন্তু দীর্ঘদিন ঘা না শুকানোর ফলে আমার মাথার অনেকটা জায়গা খুবই নরম হয়ে যায়। কোবাল্ট টিটমেন্ট করেও আমার কোন উন্নতি দেখা দিল না।

এক শনিবার আমি ভীষণ যন্ত্রণায় আবার কাতর হয়ে পড়ি। অস্ত্রোপচারের ঘা এতদিনেও বিন্দুমাত্র শুকোয়নি দেখে ডাক্তার নিজে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবু প্রবোধ দেবার জন্য জানালেন যে আর এক সপ্তাহ দেখার পর হয়তো আমাকে বাড়ী যাবার জন্য ছুটি দিতে পারবেন।

"কিন্তু ততদিনেও যদি ঘা না শুকোয় আর এভাবে পুঁজ পড়তেই থাকে তা হলে কী হবে ?" আমি জানতে চাইলাম। ডাক্তার শান্তভাবে জানালেন যে তাহলে আবার আর একটা অপারেশন করে ঐ প্লাষ্টিকের প্লেটটা বার করে আনতে হবে।

ডাক্তার চলে যাবার পর আমার স্বামী দেখা করতে এলেন। আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম।

"আমি আর কোন অপারেশন করতে চাই না," কাঁদতে কাঁদতে

বললাম আমি, "চারবার অপারেশন সহ্য করেছি আমি। আবার কাটাছেঁড়া করলে আর আমি বাঁচবো না।"

আমার স্বামী বরাবরই শান্ত বিপদে আপদে খুবই ধীর স্থির। তিনি আমাকে মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ আমার মানসিক প্রশান্তি ফিরে এল। এরপরে আমরা করোজোড়ে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করলাম। তাঁর অপার করুণায় যেন আমি এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি।

সন্ধ্যার একটু বাদে আমার স্বামী বাড়ী ফিরে যান এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার আরোগ্যের জন্য সমবেত প্রার্থনায় বসেন। প্রার্থনার আগে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুদের টেলিফোন করেছিলেন আমার জন্য প্রার্থনা করতে, তাঁর বন্ধুরাও আবার তাদের অন্যান্য বন্ধুদের টেলিফোন করে। পরে আমরা জানতে পারি যে সে রাত্রে প্রায় একই সময়ে একসঙ্গে কযেক শত নরনারী আমার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনায় বসেছিলেন। তাদের কেউ কেউ ধর্মযাজকদের সঙ্গে দেখা করেন, কেউ কেউ ধর্ম উপাসকদের টেলিগ্রাম পাঠান।

পরের দিন সকালবেলা যথারীতি ডাক্তার রুটিন মাফিক আমাকে পরীক্ষা করতে এলেন আমার মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলতে খুলতে তিনি অনেক প্রবোধ বাক্যে আমাকে আগামী অপারেশনের জন্য তৈরী করার চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ তিনি বিস্মিত কণ্ঠে জানালেন, "একি? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।" আমি বুঝলাম কিছু একটা ঘটনা ঘটে থাকবে। প্রায় অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "পুঁজ একদম নেই; ঘা শুকিয়ে গেছে এবং দগদগে নরম চামড়া স্বাভাবিক শক্ত হয়েছে। রাতারাতি এমন হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়! আমি গতকাল নিজের চোখে অবস্থা না দেখে গেলে কখনই বিশ্বাস করতে পারলাম না এমন হতে পারে।"

খুশীতে আমার বুক ভরে উঠলো। আনন্দে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল। নিজেকে সংযত করে আমি আন্তরিক গলায় ধন্যবাদ জানালাম। তিনি সব শুনে বললেন; "ধন্যবাদ আমার

প্রাপ্য নয়। তোমার এই আরোগ্য লাভে আমার কোন হাত নেই। তোমাদের বন্ধুরা, যারা কাল সারারাত প্রার্থনা করেছে তাদের ধন্যবাদ দিও।

"ক্ষতটি সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছিল। তিনি তখনই সেলাই কেটে দিলেন এবং আমাকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিলেন। ডাক্তার চলে যেতে আমার স্বামী অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে শুধু বলেছিলেন, ঈশ্বর তুমি অপার করুণাময়"।

"হাসপাতাল থেকে ছুটি নেবার সময় ডাক্তারের কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এ ব্যাপারে জানা বিশেষ কিছু আছে নাকি? আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসের (Faith) অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থা রাখি এবং আজকের ঘটনার পর আমার আস্থা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

"এখন আমি আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে এসেছি। আমি সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করি এবং সকলের জন্য রান্না নিজের হাতে করতে আনন্দ পাই। কেবল মাঝে মাঝে সামান্য মাথার যন্ত্রণা আমাকে সেই আশ্চর্যজনক রাতটির কথা, আমার দুঃস্বপ্নময় ক্ষতের কথা এবং অলৌকিক আরোগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

"প্রতিদিন প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয়ের অপার মহিমা আরো একটা দিন উপভোগ করতে পারলাম। এই করুণার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর বিশ্বাসের প্রসঙ্গে আমার মতামত কেউ কখনো জানতে চাইলে বলবো, "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন অনেক অঘটন ঘটানোর ক্ষমতা তাঁর আছে।"

* * * *

সাপের বিষ ও মন্ত্রশক্তি

আমাদের দেশে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে সাপে কামড়ানো রুগীকে মন্ত্রশক্তির জোরে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। এমন কথাও শুনতে পাওয়া যায় যে তেমন কোন গুণী ওঝার হাতে পড়লে শুধুই মন্ত্রের প্রভাবে বিষধর সাপের কামড় রুগীর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

এই আণবিক যুগেও এ বিশ্বাস আমাদের দেশে অত্যন্ত ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত। এদেশ ছাড়াও বাইরের অন্য বিভিন্ন অঞ্চলে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগের নানা পদ্ধতি চালু রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের একজন প্রখ্যাত ওঝা দাবী করেন যে তিনি মন্ত্র শ্রাবণ করতে করতে মৃতপ্রায় রুগীকে একটা চাপড় মেরে সুস্থ করে তুলতে পারেন। টেলিফোনে মন্ত্র উচ্চারণ করে রুগীকে সুস্থ করে তোলার নজির তিনি পেশ করতে পারেন এমন দাবীও করেন তিনি।

দাক্ষিণাত্যের জনৈক ওঝা জানান—সাপের কামড় থেকে বাঁচিয়ে তোলার অব্যর্থ মন্ত্রের অধিকারী তিনি। টেলিগ্রামে সেই মন্ত্র পাঠিয়েও রুগীকে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। যদি কেউ জরুরী টেলিগ্রামে রুগীর নাম ঠিকানা পাঠায় তাহলে তিনি তাকে নিশ্চিতভাবে নিরাময় করে তুলতে পারবেন। এমন কি সে অঞ্চলের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ দপ্তর এধরণের টেলিগ্রামের আদান প্রদান সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সাপে কামড়ানোর নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রদ কোন ওষুধ আবিষ্কার করা আজও সম্ভব হয়নি বলেই মন্ত্রের উপরে অনেকেই কিছু কিছু আস্থা রাখেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা ওষুধের চেয়ে মন্ত্রকে অধিক কার্যকর বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন না। এ্যান্টিভেনাম ওষুধ প্রয়োগে কিছু রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হলেও বিজ্ঞানীরা আজও সাপের বিষের নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক আবিষ্কারের কাজে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মন্ত্রশক্তির অন্ধবিশ্বাসীদের এটুকু জানানো যায় যে আমাদের দেশে বেদে ও অন্যান্য সম্প্রদায়ে যারা বংশ পরম্পরায় অনাদি অতীত থেকে সাপের সঙ্গে বাস করে ও সাপের খেলা দেখিয়ে অর্থ রোজগার করে তারাও স্বীকার করেছে যে সাপের কামড় থেকে বাঁচার কোন উচাটন মন্ত্র আছে বলে তাদের জানা নেই। প্রতি বছর তাদের সম্প্রদায়ের বহু লোক সাপের কামড়ে মারা যায়।

সম্প্রতি পরামনোবিজ্ঞানীরা এই মন্ত্রশক্তির বৈজ্ঞানিক কোন স্থায়িত্ব আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করছেন। দি মাইণ্ড সায়েন্স ফাউণ্ডেশন, সান ডিয়াগো, টেক্সাসের প্রযোজনায় জয়পুর রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিজ্ঞান বিভাগ তার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সাপের বিষের উপর মন্ত্রশক্তির কোন প্রভাব আছে কিনা তা নিয়ে প্রায় দশ বছর গবেষণা করেছে। সেই গবেষণার প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই গবেষণার সময় পরামনোবিজ্ঞান বিভাগ-সংশ্লিষ্ট বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, যে সব সাপুড়ে ও ওঝা মন্ত্রের জোরে সাপে কামড়ানো রুগীকে সারিয়েছে বা সারাতে পারে বলে দাবী করেছে তাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য সর্পহত বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, যথা, ছাগল, ভেড়া, খরগোস ইত্যাদিকে সারিয়ে তুলতে বলা হয়। এই পরীক্ষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে করা হয়। পরীক্ষায় ফলাফল ও পর্যাপ্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন যে মন্ত্রের দ্বারা বা মানসিক কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিষাক্ত সাপের কামড় থেকে কোন রুগীকে বাঁচান সম্ভব নয়।

মন্ত্রশক্তির অলৌকিক ক্ষমতায় সুস্থ হয়েছে এমন রুগীদের পরীক্ষা করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, হয় তাদের বিষাক্ত সাপ তেমন কায়দা করে কামড় বসাতে পারেনি অথবা নির্বিষ সাপে

কামড়াচ্ছে। মন্ত্রশক্তিতে সুস্থের ক্ষেত্রে একটি রহস্যময় ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে তা হল 'বিলম্ব'। সাপে কামড়ানো রুগীরা সাধারণত গ্রামাঞ্চলের মানুষ। সেখানে যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল। ওঝাদের কাছে 'তখনো জীবিত' যে সব রুগী আনা গেছে তারা প্রকৃত সাপের কামড়ের বেশ কিছু বিলম্বে পৌঁছেছে এবং বেঁচে উঠেছে।

অনেকেই জানেন যে সত্যিকারের সাপের ঠিকমত কামড়ে আহত ব্যক্তি আধ ঘণ্টার মত সময় বেঁচে থাকতে পারে। এর আগেই সাধরণত মৃত্যু ঘটে থাকে। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে-সব রুগী এই আধ ঘণ্টার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে (এবং ওঝার কাছে পরে পৌঁছে সুস্থ হয়ে যায়) তাদের হয় নির্বিষ সাপে অথবা বিষধর সাপে বেকায়দায় কামড়েছে। এই 'বিলম্ব'ই ওঝাদের হাতে নিহত রুগীর সংখ্যা কমিয়ে সুস্থ দাবীদার রুগীর সংখ্যা বাড়িয়েছে।

এই প্রবন্ধ ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায দশ বছরের গবেষণা কাজের ফলাফলের উপরে নির্ভর করে লেখা হল। যদিও প্রচুর সময় ও অর্থব্যয়ের পর দেখা গেল সাপের বিষের ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তি পরামনো-বিজ্ঞানে এ যাবৎ নির্ধারিত সংজ্ঞার স্বপক্ষে কাজ করলো না তবু-ও এর থেকে আমাদের এক দীর্ঘস্থায়ী অন্ধ-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণার ফলাফলের পর মন্ত্রশক্তিতে সুস্থ হয়ে ওঠার (সাপের বিষ থেকে) ভুল সংবাদ বিজ্ঞানীদের আর বিভ্রান্ত করবে না এবং তাদের প্রকৃত প্রতিষেধক আবিস্কারের কাজে উৎসাহিত করছে। আর সাধারণ জনসমাজ বিজ্ঞানসম্মতভাবে সত্য বলে নির্ধারিত হয় নি এমন অন্য বিভিন্ন বুজরুকি ও তুক্ তাক প্রভৃতি থেকে সতর্ক হতে পারবে।

* * * *

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের পরা-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা

উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার শহর জনপদ থেকে দূরে জঙ্গলের নিবিড় আঁধারে বসবাস করে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সম্ভবত পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদেরা ধারণা করেন এরা প্রস্তর যুগের মানুষ এবং এদের বংশধররা প্রাগৈতিহাসিক নিয়ানডার্থালয়েড সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সম্ভবতঃ এদের আদিপুরুষেরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে জাভায় বাস করতো—এখন যাদের এ্যাসট্রোলয়েড সম্প্রদায় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

খাবার হিসাবে এরা নির্বিকারচিত্তে পাইথন সাপ খায়, এক টিন তামাকের জন্য স্ত্রীকে বিক্রী করে দেয় এবং এমন বিচিত্র সব তুকতাক ঝাড়ফুক করে যার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এরা অত্যন্ত জটিল ও অলৌকিক সব মানসিক ক্ষমতার অধিকারী। মিশনারী, সরকারী কর্মচারী, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি কিংবা নৃতত্ত্ববিদ, যাঁরা এই আদিবাসীদের সঙ্গে থেকেছেন বা কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই এদের টেলিপ্যাথি বা ক্লেয়ারভয়েন্স প্রভৃতি অনুভাবনা করতে পারার কথা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। এদের এই মানসিক ক্রিয়াকর্মগুলি পরামনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়।

কিন্তু এদের জীবনযাত্রা নানাবিধ বিশ্বাস এবং আচার আচরণ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করার যথেষ্ট অসুবিধা আছে। সাধারণতঃ এরা অপরিচিতদের কাছে নিজেদের প্রকাশ করতে চায় না। নৃতত্ত্ববিদেরাও এবিষয়ে খুব একটা সফল হতে পারেননি, ফলে তাঁরা এদের মানসিক ক্ষমতার কিংবদন্তী ও অন্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কাহিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। এদের সম্পর্কে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরামনোবিদ্যার গবেষণা বিশেষ এগোয়নি।

বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আদিবাসীদের নানা প্রথা ও সংস্কার ইত্যাদি পরোক্ষভাবে বহু বিচিত্র ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবনা ও অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত। এ থেকে

তাদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দাবীকে এক রকম স্বীকৃতিই দেওয়া হয়েছে ঃ

একটি মন্ত্রপূত 'হাড়ের দিক পরিবর্তনের দ্বারা মৃত্যু' বা 'গান গেয়ে মৃত্যুকে আবাহন' কিংবা গ্রাম্য 'ওঝার মূত্রাশয়কে মন্ত্রের জোরে ফাটিয়ে মেরে ফেলার' ভয়াবহ হুমকি ইত্যাদির অনেক খবর ক্রমশ আমরা জানতে পেরেছি। এদের নিঃশব্দে আঙুলে আঙুলে ছোঁয়ানোর মাধ্যমে সংবাদের আদান প্রদান, পেশী-সঞ্চালনের মাধ্যমে ইঙ্গিত, ধোঁয়ার সংকেত ও সাংকেতিক কাঠির সঙ্গে পরিচিত আছেন অনেকেই হয়ত।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মানসিক বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য জানতে হলে এদের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। এদের মনের বিকাশ সাধারণ মানুষেব থেকে কিছু কম নয। এদের জীবনযাপনের আদিম রীতিনীতি দেখে এদের বুদ্ধির পরিমাপ করতে গেলে আমাদের ভুল হবে। এদের ব্যবহারিক জীবন যাত্রায কোন উন্নতি না হওয়ার জন্য মুখ্যতঃ এরাই দায়ী। এরা বিশেষভাবে নিজেদের প্রচলিত রীতি ও বংশানুক্রমিক ধারা ইত্যাদি মেনে চলে এবং নিজেদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মেনে চলার ব্যাপারে কঠোর নিয়মানুগ।

পরামনোবিজ্ঞানীরা এদের 'সবজান্তা' পুরোহিতের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। শোনা যায় এই গ্রাম্য পুরোহিতেরা (বা ওঝারা) নিজেদের খুশী মত নানা মানসিক ক্রিয়া, যাদু, তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন ইত্যাদি করতে পারে। এই সব বিশেষ ক্ষমতার জন্য পুরোহিতেরা অন্য আদিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট মান্যতা পেয়ে থাকে—এদের ক্ষমতাকে সম্প্রদায়ের সমস্ত আদিবাসীরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে।

জীববিজ্ঞানীরা মানবমনের অজানা রহস্যের সন্ধানে আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। এদের থেকেও আদিমতম কোন সম্প্রদায় বা সমাজ ব্যবস্থা আছে কিনা জানা যায় না এবং এদের সম্মোহন, টেলিপ্যাথি ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভাবনার চেয়ে

ভালো গবেষণার বিষয় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এই আদিম অধিবাসীরা সন্দেহাতীত ভাবে বর্তমান জগতে সবচেয়ে স্পর্শসচেতন, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বহ এবং মানসিক ক্ষমতা (Psychic) সম্পন্ন জাতি। এরা মনের ভাব প্রকাশে শব্দ বা ভাষার ব্যবহার খুব কম করে থাকে। 'সাইকিক' কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'সাইকিকোস' থেকে, যার অর্থ 'আত্মা', 'জীবন', 'আধ্যাত্মিক' প্রভৃতি। অশারীরিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতাও বোঝায় কথাটিতে। আদিম অধিবাসীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে কথাটি বিশেষ উপযুক্ত।

এদের ওঝারা মন্ত্রবলে তাদের শত্রুদের মৃত্যু ঘটিয়ে তাদের আত্মার সাহায্যে নিজেদের লোকদের সুস্থ করে তোলে। বিভিন্ন লেখক এদের ভণ্ড বুজরুক বলেছেন। কিন্তু এধরণের মন্তব্য ঠিক নয়। ওঝারা আত্মাকে আনতে পারুক বা না পারুক সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এরা এমন কিছু একটা তুকতাক করে যার প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেছে। তাছাড়া ওঝারা নিজে অসুস্থ হলে অন্য ওঝাকে ডেকে পাঠায় এবং তুকতাকের পর তার অপহৃত আত্মা আবার শরীরে ফিরে এসেছে জেনে আশ্বস্ত হয়। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা ছলচাতুরী প্রচ্ছন্ন থাকলেও রুগী কিন্তু এভাবেই সুস্থ হয়ে ওঠে। অন্যের ক্ষতি বা উন্নতি করতে এদের মন্ত্র-তন্ত্র বিশেষ ফলপ্রদ।

বিশ্বাস ও মনের জোরে যে রোগমুক্তি হতে পারে এটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ার এই আদিম অধিবাসীরা 'এই বিশ্বাসকে উল্টোভাবে কাজে লাগায়—এদের ওঝারা যদি কোন মৃত্যুগান' শোনায় বা 'হাঁড়টি কারুর দিকে লক্ষ্য রেখে' অভিসম্পাত দেয় তাহলে তার যে মৃত্যু অনিবার্য, সেই বিশ্বাসে এরা মারাও যায়। খুবই অবিশ্বাস্য মনে হবে কিন্তু আজও যে কোন আদিবাসী তাদের ওঝার অভিসম্পাত শুনলে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে নেবে। সম্প্রদায়ের প্রশাসন কর্তা (এদের ভাষায় 'মুল্লুনগুয়া') সম্মোহিত অবস্থায় এভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে চলেছে এই বিংশ শতাব্দীতেও।

বহু সম্প্রদায়ের ওঝারা দাবী করে থাকে যে তারা মহাশূন্যে উড়ে

বেড়াতে (অবশ্য কল্পনায়) পারে এবং অন্যত্র কি ঘটে চলেছে তা দেখতে পায়। এখানে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে ওঝাদের ওই দাবী আদিবাসীরা অযথা অবাস্তবভাবে মেনে নেয়নি, তারা প্রত্যক্ষ ফল দেখার পর তবেই বিশ্বাস করেছে।

টমি টুফিঙ্গার একদিন রাত আড়াইটের সময় তার মালিককে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। ভদ্রলোক খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানে সেখানে এসেছিলেন। টু ফিঙ্গার তাকে জানালে যে তাকে ছুটি দিতে হবে কারণ তার কাকা নাকি খুব বিপদে পড়েছে, সম্ভবতঃ এতক্ষণে মারা গেছে। পরে খবর নিয়ে দেখা গেল সেখান থেকে প্রায় পঁচাত্তর মাইল দূরের এক গ্রামে তার কাকা আচমকা এক দুর্ঘটনায় সেদিন রাত আড়াইটায় মারা যায়।

কুইনি নামে মেয়েটি সম্প্রদায়ের সমস্ত কুকুরদের দেখাশোনা করে। একদিন সে ম্যানিনগ্রিডা সরকারের সুপারিন্টেনডেণ্টের অফিসে সকালে গিয়ে জানালে, "আমার ভাইটা বোধহয় মরেই গেল।" সুপারিন্টেনডেণ্ট জানতেন যে কুইনির ভাই প্রায় দু'শ মাইল দূরে কেপ ইয়র্কে কাজ করে। তিনি জানালেন, "তুই আবার স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিস, কুইনি।" কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ওয়ারলেসে খবর এল যে, "সকাল পাঁচটার সময় কুইনির ভাই মারা গেছে, কাছাকাছি থাকলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।" খবরটা জানানোর সময় সুপারিন্টেনডেণ্ট কুইনিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এটা আগে কি করে জানতে পেরেছিলি?" কুইনি নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়, "এমনিই বুঝতে পেরেছিলাম।"

আদিম জাতিদের ধোঁয়ার সংকেত (Smoke Signal) সম্পর্কে অনেকেই কৌতূহল বোধ করেন। দূর-দূরান্তরে সংকেত পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে এটাকে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু এটাকে খুব একটা পরিশীলিত উপায় বলে মনে করা অন্যায় হবে। ধোঁয়ার সংকেত সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির উপস্থিতি ও তার অবস্থান বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আদিবাসীরা সাধারণতঃ নিজেদের

এলাকায় অন্যের অনুপ্রবেশ পছন্দ করে না। অন্য সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার সংকেত পাঠিয়ে আগাম তার আগমন-বার্ত্তা জানায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ ডাকহরকরা আছে, তাদেরকে আশেপাশের সকলেই মোটামুটি চেনে। তাদের প্রায়ই অন্য গোষ্ঠী-প্রধানের কাছে একটা 'সংবাদ-যষ্টি' দিয়ে পাঠানো হয়। অনেকটা আমাদের রাজদূতের মত ব্যাপার আর কি। সংবাদ-যষ্টির রকমফের থেকে (message-strick) উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ কিংবা এলাকা দিয়ে যাবার অনুমতির আবেদন ইত্যাদি বুঝতে পারা যায়।

এই ডাকহরকরারা প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় আগুন জ্বালিয়ে তার আগমনের সংকেত প্রতিবেশী গোষ্ঠীকে জানিয়ে থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এই ধোঁয়ার সংকেত প্রায় ১০০ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় এবং কোন্ সম্প্রদায়ের লোক আসছে তা সংকেত আসার দিক থেকে অন্যেরা অনুমান করতেপারে।

এদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের এত কাহিনী যাচাই করে দেখার পর প্রথাগত ভাবে রেকর্ড করা হয়েছে যে সেগুলোকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কয়েক শ' মাইল দূরে যে ঘটনা ঘটছে তার অনুভাবনা কেমন করে তারা করতে পারে একথা তাদের জিজ্ঞাসা করলে লঙ বিলি ও তার বৌ পেগী জানায়, "আমরা জানতে পারি, পরিষ্কারভাবে জানতে পারি।" গোষ্ঠী প্রধান ডাঙ্কি ও তার সাত বৌ জানালে, "স্বপ্নে দেখতে পাই।" কুনাপিপির দল-প্রধান জানায়, "স্বপ্নের ব্যাপার।"

যাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন উত্তর একই পাওয়া যায়, 'আমরা জানতে পারি' অথবা 'স্বপ্নের ব্যাপার।'

অবশ্য সাধারণ 'স্বপ্ন দেখা' বলতে যা বোঝায় এই আদিবাসীদের কাছে তার অর্থ কিছুটা ভিন্ন। উপদেবতা ও তাদের কাহিনী এদের বিশ্বাস ও জীবন যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সৃষ্টির

আদিকাল (যেটাকে এরা 'স্বপ্ন কাল' বলে) এদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র মুহূর্ত। তারা বিশ্বাস করে যে স্বপ্ন-কাল তাদের ধরিত্রী মাতা ও রামধনু দেবতাকে সৃষ্টি করেছে। কুনাপিপি সম্প্রদায়ের সকলেই তাই বিশ্বাস করে। তারা জানে যে সেই অতীত স্বপ্ন-কাল এবং বর্তমানেও ধরিত্রী মাতাই মানব ও প্রকৃতিতে প্রাণের উৎস। তিনিই সমস্ত টোটেম উপদেবতাদের জন্ম দিয়েছেন, পশু-পাখী সরীসৃপ ও বিভিন্ন জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণ দিয়েছেন -রামধনু দেবতা 'পথ তৈরী করে দেবার পর' তিনিই আকাশ দেবতা ও অন্য শিশু উপদেবতাদের এনেছেন। সমস্ত জীবিত প্রাণীর দ্বিতীয় আর একটা আত্মা আছে বলে তারা মনে করে এবং ভ্রাম্যমাণ কোন আত্মার শরীরে অনুপ্রবেশের জন্যেই শিশু জন্ম নেয় বলে বিশ্বাস করে। নরনারীর মিলনে গর্ভ ধারণের সম্ভাবনার কথা তারা জানে না এবং মানতেও চায় না।

অন্যান্য মানসিক চেতনার মধ্যে দেখা যায় এরা তাৎক্ষণিক স্বচ্ছন্দ দর্শন ও টেলিপ্যাথিতে পারদর্শী। বহু ঘটনা থেকে এদের 'দুটি আত্মার' অবস্থানের যে বিশ্বাস রয়েছে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এরা ভৌতিক কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপও করতে পারে বলে শোনা গেছে। বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান পালন করে এদের ওঝারা বৃষ্টিপাত করাতে পারে। আগুনের বিস্তৃত কুণ্ড বানিয়ে তার উপর খালি পায়ে হেঁটে যায় অথচ পায়ে কোন ফোস্কা পড়ে না। এপর্যন্ত যত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংবাদ জানা গেছে দেখা যায় প্রত্যেকেই ভূত প্রেতের উপস্থিতি স্বীকার করে এবং কেউ কেউ তাদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলে থাকে বলে দাবী করে। এদের লোকালয়ের কিছু কিছু স্থান ভূতুড়ে হিসেবে এরা আলাদা করে চিহ্নিত করে রাখে। কারণ সেখানে নাকি নিয়মিত ভূত প্রেত অবস্থান করে। সভ্যজগতের আলো থেকে বঞ্চিত এদের জীবন প্রণালী আমাদের বিস্মিত করলেও এদের সভ্যতার আলোয় নিয়ে আসা খুব সহজ নয় কারণ এরা নিজেদের মতবাদে থাকতেই আগ্রহী।

আগের বিভিন্ন অধ্যায়ে এপর্যন্ত যে সব অনুভাবী ও সাবজেক্টদের ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তারা সকলেই তাদের পরাস্বাভাবিক ক্ষমতার অতিরিক্ত অধিকারী ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষ। এরা আমাদের অন্য পাঁচজনের মত সাংসারিক জীবন যাত্রার পরিমণ্ডলে বাস করে। কিন্তু এই অধ্যায়ে দু'জন ভিন্নধর্মাবলম্বী মহামানবের জীবনকাহিনী আলোচনা করবো যাঁরা সধর্মে অবতার হিসেবে পূজিত হন। একজন তিব্বতীদের ধর্মপ্রধান দালাই লামা ও অন্যজন দক্ষিণভারতের শ্রীসত্য সাঁই বাবা। আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার এঁরা একধারে প্রণম্য মনীষী এবং বিভিন্ন ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। এঁদের ধর্মমত ও বিশ্বাসের দিকটি নিয়ে মত প্রকাশের বদলে এঁদের অলৌকিক ক্ষমতার পরাস্বাভাবিক প্রসঙ্গটি নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করার চেষ্টা করা হল। কোন তুলনামূলক বিচারও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

দালাই লামা ও তিব্বতীয় জন্মান্তরবাদ

সাধারণ জনমানসে তিব্বত সমন্ধে এক বিশেষ কৌতূহল রয়েছে। কেননা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এই নিষিদ্ধ দেশে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ও সেখানকার লোকদের জীবনধারণ ও আচরণ সম্পর্কে জানা প্রায় সাধ্যাতীত ছিল। অতীতে তিব্বত বিদেশীদের কাছে এক রহস্যময় পর্দার আড়ালে অন্তর্নিহিত ছিল। তিব্বতীরাও তাদের দেশ ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অন্য দেশের এই আগ্রহকে প্রশ্রয় দেয় নি। ১৯০৪ সালে ইয়ং উসল্যাণ্ড নামে জনৈক ইংরাজ সেনাপতি প্রথম হাঁটাপথে তিব্বত পৌছান। ঘটনাটি প্রায় যুদ্ধের ইতিহাসের মতই রোমাঞ্চকর। কিন্তু তাঁর এই অনুপ্রবেশের পরও

তিব্বত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তিব্বত যথাপূর্ব রহস্যময়ই থেকে গেছে।

তিব্বতীয় সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা কিনা তিব্বতের জনসাধারণের উপরে অতীতে এবং বর্তমানে সমান প্রভাব বিস্তার করে আছে তা হল এদেশের ধর্ম। ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য এদের চিন্তা ও কর্মধারাকে পরিচালনা করে থাকে।

সপ্তম শতাব্দীতে নেপাল, ভারতবর্ষ ও চীনদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এদেশে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। আজকের তিব্বতের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মেরই এক বিশেষ উন্নত রূপান্তর। প্রায় ১৬৪২ সাল থেকে ধর্ম তিব্বতের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় পরিচালনা করতে থাকে এবং সমস্ত সামাজিক ও রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় বিষয় ধর্মের অধীন বলে গণ্য করা হয়।

তিব্বতের ধর্মীয় অনুশাসন পরিচালনা করেন লামারা। লামাদের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ হলেন দালাই লামা। বিদেশীদের কাছে দালাই লামারা এক চরম রহস্যময় বিষয়ের প্রতিভূ ছিলেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বসবাসকারী দালাই লামার প্রকৃত নাম তেনজিন গ্যাটসো। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দালাই লামা পরম্পরায় ইঁনি চতুর্দশ দালাই লামা। ইঁনিই সর্বপ্রথম হাজার বছরের পুরানো এই রহস্যের কুহেলিকার আবরণ উন্মোচন করেন। তিনি মনে করেন দালাই লামা সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক যাচাই হওয়া প্রয়োজন। তাঁর ধারণা এই ধর্মীয় সংস্কারের অনেকগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

দালাই লামা নির্বাচনের চিরাচরিত প্রথাটি তিব্বতীয় ধর্মের এক বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য। এর প্রথা সুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে।

সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতের ধর্ম 'বন' ধর্মরূপে পরিচিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। সুরুতে এই ধর্ম কেবলমাত্র রাজপরিবার ও কিছু উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে

সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন 'বন' ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ধর্মকে অবজ্ঞা করতেন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারক স্বনামধন্য পণ্ডিত অতীশ তিব্বতে আসেন। তিনি তিব্বতীয় জনসাধারণকে নূতন করে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর থেকেই এদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ সমৃদ্ধরূপে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। দেশে বহু অর্থব্যয়ে উপাসনালয় তৈরী করা হয় এবং ক্রমশ ধর্মীয় নেতারা দেশে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৩৫৭ থেকে ১৪১৭ খৃঃ মধ্যে তিব্বতের প্রখ্যাত ধর্মনেতা ৎসং খাপা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গেলুগপা নামে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তিব্বতে সাধারণভাবে তারা 'হলদে টুপি' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য মোটামুটি ভাবে দুটি ছিল। জাঁকজমক ও আড়ম্বরের চেয়ে আধ্যাত্মিক দিকটির বেশী প্রাধান্য রেখে ধর্মের প্রচলিত অনুশাসনগুলির সংস্কার করা এবং ক্রমশ তিব্বতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পৃথক সম্প্রদায়কে একত্রিত করে এই ধর্মের অধীনে আনা।

ৎসং খাপার ভাইপো গেডুন ট্রুপ্পা (জন্ম ১৩৯৯ সাল) পরবর্তী নেতা হন। তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের তিনি আরো বিস্তৃত প্রচার করেন। তাঁর সময়েই বহু তিব্বতীয় গেলুগপা সম্প্রদায়ে যোগদান করে। ১৪৭৫ খৃঃ মৃত্যু পূর্বকালে তাঁকে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধর্ম-যাজকরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জনশ্রুতি আছে মৃত্যুর কয়েক বছর পরে গেডুন ট্রুপ্পা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন গেডুন গ্যাটসো রূপে (পরবর্তী ধর্মপ্রধান)। গেডুন গ্যাটসো আবার তাঁর মৃত্যুর পর সোনাম গ্যাটসো রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সোনাম গ্যাটসো অত্যন্ত বিদ্বান ও নিষ্ঠাবান ধর্মযাজক ছিলেন। ১৫৭৮ খৃঃ তিনি মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে সেখানকার রাজা আলতান খাঁ ও তাঁর অনুচরবর্গকে ধর্মান্তরিত করেন। রাজা আলতান তাঁকে

'দালাই' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিব্বতী ভাষায় 'দালাই' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র'। পরে এই দালাই উপাধি সোনাম গ্যাটসের দুই মৃত পূর্বসূরীদের উপরও প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ গেড়ুন গ্যাটসো ও গেড়ুন ট্রুপ্পা 'দালাই লামা' উপাধিতে চিহ্নিত হন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দালাই লামা হিসেবে পরিচিত হন।

গোড়ার দিকে দালাই লামারা কেবলমাত্র গেলুগপা সম্প্রদায়েরই ধর্মপ্রধান ছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ তিব্বতের অধিপতি মঙ্গোলিয়ার রাজা গুর্সি খাঁ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লামাদের পদচ্যুত করেন এবং তৎকালীন দালাই লামাকে (ইনি পঞ্চম দালাই লামা) সমগ্র তিব্বতের প্রধান ধর্মযাজকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চম দালাই লামার নাম ছিল নাগাওয়ান লোলজান গ্যাটসো।

১৬৬৫ খৃঃ রাজা গুরসি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা তিব্বতের শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নি। দালাই লামাই তখন তিব্বতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল বিষয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং সেই ব্যবস্থাই ত্রয়োদশ দালাই লামা পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

ত্রয়োদশ দালাই লামার প্রকৃত নাম থুমটেন গ্যাটসো। তিনি ১৮৭৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। থুমটেন গ্যাটসোর পরিচালনাধীনে তিব্বতীয়দের জীবনযাপন খুব সরল ও সুখের ছিল। তিনি তিব্বতের রাজনৈতিক পরিচিতির উন্নতি সাধনেও সফল হয়েছিলেন।

১৯৩৩ খৃঃ ত্রয়োদশ দালাই লামার ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পুনর্জন্মের খোঁজখবর সুরু হয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস প্রত্যেক দালাই লামাই মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই পরবর্তী দালাই লামা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম দালাই লামা গেড়ুন ট্রুপ্পা যখন ১৯১৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁকে চেনয়েসি অর্থাৎ তথাগত বুদ্ধের (মতান্তরে অবলোকিতেশ্বর) অবতাররূপে গণ্য করা হয়েছিল। তিব্বতের প্রচলিত বিশ্বাস হল চরাচরের সকল

নিরপরাধ প্রাণের রক্ষার্থে তথাগত বুদ্ধ বারবার জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জীবিত দালাই লামাকে তাঁর পরবর্তী দালাই লামার জন্মান্তরিত রূপ হিসেবে ধরা হয়। সে কারণে কোন একজন দালাই লামা একক ব্যক্তিসত্তা নন। তিনি অগ্রবর্তী সকল দালাই লামাদের সম্মিলিত রূপ।

ড বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে ভারতবাসী চতুর্দশ দালাই লামাকে তার নিজের নিবাচন ও অনুসন্ধানের বিষয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি জানালেন এ ব্যাপারে তাঁর স্মৃতি খুবই অস্পষ্ট। কারণ তখন তিনি নিতান্তই শিশু ছিলেন। তবে দালাই লামা হিসেবে তাঁর অভিষেক ও আবিষ্কারের কাহিনী লোকপরম্পরায়, বিশেষ করে দাজামা কুমসঙ্গটাবার (তিব্বতের প্রধান সেনাপতি) কাছে যে ভাবে শুনেছিলেন সেই কাহিনী বলেন। এই সেনাপতি তৎকালীন নিবাচন ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

১৯৩৩ খৃঃ ত্রয়োদশ দালাই লামা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তার পুনর্জন্ম গ্রহণের কিছু আগাম তথ্য প্রকাশ করে যান। তাঁর নির্দেশ মত মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ 'পোটালা' ভঙ্গিতে (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের বহুল প্রচারিত প্রচলিত উপবিষ্ট আসন গ্রহণ পদ্ধতিতে) দক্ষিণমুখো করে বসিয়ে রাখা হয়। একদিন সকালে দেখা গেল মৃতদেহের মুখ পূর্বদিকে পরিবর্তিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ রাজজ্যোতিষীকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হয়, তিনিও যোগাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর হাতের চাদর পূর্বদিকে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তথাপি প্রায় বছর চতুর্দশ দালাই লামার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এই অনিশ্চয়তার জন্যে তিব্বতের তৎকালীন রাজা চো-খোরগাই নামে সুবিখ্যাত হ্রদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করলেন। তিব্বতে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কেউ এই হ্রদের জলে তাকালে তার আকাঙ্ক্ষিত অদূর ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। দীর্ঘ প্রার্থনার পর রাজা সেই হ্রদের জলে চূড়াওয়ালা তিনতালা

তিব্বতীয় নামগুলির সঠিক উচ্চারণ বাংলায় করা বেশ মুশকিল, আমরা রোমান স্ক্রিপ্টের অনুসরণ করেছি।

মন্দির ও তার পাশেই ত্রিকোণাকৃতি দেওয়াল বিশিষ্ট একটি কুঁড়ে ঘর দেখতে পান। এই দিব্য অনুভবে রাজা অত্যন্ত পুলকিত হৃদয়ে লাসায় (তিব্বতের রাজধানী) ফিরে এলেন। এবার জোরদার অনুসন্ধান কাজ সুরু হয়। অনুসন্ধান কাজে সারা তিব্বত-ই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। কারণ পরবর্তী দালাই লামা না পাওয়া পর্যন্ত তিব্বতীরা নিজেদের রক্ষাকর্তাবিহীন বলে মনে করে।

সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি (অবশ্য তা সঠিক নয়) যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের ধারণা কিছু ভিন্ন প্রকারের। তাদের মতে তথাগতের স্বর্গীয় আবাস ছেড়ে পুনরায় মানবরূপে জন্মগ্রহণে একাধিক বছর অতিক্রান্ত হতে পারে। সে কারণে চতুর্দশ দালাই লামার জন্যে সরকারীভাবে ১৯৩৭ খৃঃ অনুসন্ধানকার্য সুরু হয়। পূর্বদিক সম্বন্ধে দৈবনির্দেশ থাকায় অনুসন্ধানকারীরা স্বর্গীয় শিশুটির খোঁজে পূর্বদিকে যাত্রা সুরু করেন। অনুসন্ধানকারীরা সকলেই লামা ছিলেন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অনুসন্ধান কাজ চালাতে থাকেন। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন করে রাজকর্মচারী ছিলেন—সকল দলের সঙ্গেই ত্রয়োদশ দালাই লামার ব্যবহৃত নানা প্রকারের বস্তু ছিল।

একটি দলের পরিচালনা করছিলেন কায়েৎসাং রিমপকে। তাঁরা চীনা অধিকৃত চিখাই প্রদেশের অমদো জেলায় পৌঁছলেন। লামা প্রথার সংস্কারক পূর্ব বর্ণিত পণ্ডিত ৎসং খাপা এখানে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। এখানে অনুসন্ধানকারীরা অনেকগুলি বালককে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল লাভ হল না। ক্রমশ তাঁরা ভয় পেলেন যে তাঁদের অনুসন্ধান কাজ বিফলে যাবে।

অবশেষে বহু ঘোরাঘুরির পর তাঁরা সোনার গম্বুজওলা তিনতলা এক বিহার দেখতে পেলেন আর আশ্চর্য বিহারের পাশে ত্রিকোণা-

কৃতি দেওয়াল বিশিষ্ট একটি কুঁড়ে ঘরও রয়েছে দেখা গেল। তাঁরা আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। সকলেই নিজেদের পোষাক পরিবর্তন করে চাকরের বেশ ধারণ করে কুটিরে প্রবেশ করলেন। পোষাক পরিবর্তন এই ধরণের অনুসন্ধান কাজে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের অসুবিধা অনেক।

কুটিরে প্রবেশ করেই তাঁরা নিশ্চিতভাবে অনুভব করলেন যে, এখানেই সেই পবিত্র শিশুকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাইরের দিকে রান্নাঘরের নিকটে অপেক্ষা করতে অল্পক্ষণের মধ্যে একটি দু-বছরের শিশু দৌড়তে দৌড়তে এসে একজন লামার জামা ধরে টানতে থাকে। এই লামার গলায় ত্রয়োদশ দালাই লামার জপের মালাটি ছিল। শিশুটি দ্বিধাহীন কণ্ঠে 'সেরা লামা' 'সেরা লামা' বলে চীৎকার করে ওঠে। ভৃত্যের বেশে লামাদের চিনতে পারাই যথেষ্ট আশ্চর্যের ব্যাপার, তদুপরি লামাটি 'সরা' ধর্ম সম্প্রদায়ের পুরোহিত ছিলেন, তাঁকে সনাক্তকরণ তো অলৌকিক। বালকটি লামার জপের মালাটি নেবার জন্যে কান্নাকাটি করতে থাকে। সেটি তাকে দেওয়া হলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের গলায় পরে নেয়। এই শিশুই যে জন্মান্তরিত চতুর্দশ দালাই লামা, এর পরে লামাদের আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অনুসন্ধানকারীরা সকলেই নত-মস্তকে শিশুটিকে অভিবাদন করলেন।

তখনকার মত তাঁরা সেই চাষী পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন কিন্তু পরের দিন আবার এলেন। এবারে তাঁরা কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেন নি। বালকটির পিতামাতার সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল, তাঁদের আর একটি ছেলে কোন এক ধর্ম সম্প্রদায়ে ইতিপূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। শিশুটি তখন ঘুমোচ্ছিল। অনুসন্ধানকারী চারজন লামা শিশুটিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে উপাসনার ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। প্রথমে শিশুটিকে চারটে জপের মালা

দেখান হল। তার মধ্যে সব থেকে পুরোনো জীর্ণ মালাটি ত্রয়োদশ দালাই লামার। বালকটি অবিচলিত ও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সেই মালাটি বেছে নিয়ে গলায় পরে আনন্দে সারা ঘরময় নেচে বেড়াতে থাকে। এর পরে বিভিন্ন ঘন্টির মধ্যে থেকে বালকটি পূর্বের দালাই লামা চাকরদের ডাকার জন্যে যেটি ব্যবহার করতেন সেটি বেছে নেয়। তাকে আবার কতকগুলো ছড়ি দেখানো হলে সে দালাই লামার অতি সাধারণ ও পুরাতন ছড়িটি হাতে নেয় ও সেই সঙ্গে রাখা হাতীর দাঁতের বা রুপার কাজ করা হাতলবিশিষ্ট ছড়িগুলির প্রতি লক্ষ্যমাত্র করে না। বালকটিকে পরীক্ষা করার সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন জন্মান্তরিত চেনরেজির (অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বর) সব বৈশিষ্ট্যগুলিই তার মধ্যে রয়েছে, সেই রকম লম্বা বড় বড় কান এবং দেহে এমন স্থানে আচিল রয়েছে যে, সে দুটিকে চতুর্ভুজ ভগবানের দ্বিতীয় দুটি হাতের স্মৃতি চিহ্নের মত মনে হয়।

অনুসন্ধানকারী লামারা স্থির নিশ্চিত হলেন যে এতদিন তারা যা খুঁজছিলেন তার সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। তাঁরা গোপন সাংকেতিক লিপিতে চীন ও ভারতের পথে রাজধানী লাসায় তার-বার্তা পাঠালেন এবং তৎক্ষণাৎ লাসা থেকে উত্তর পেলেন সব রকমে চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করার বিষয়টি জানাজানি হলে নানাবিধ অহেতুক কৌতূহলে এই অভিযানের সফলতা ব্যর্থ হতে পারে। চারজন লামা তথাগতের একটি আবক্ষ ছবির সামনে নতমস্তকে সম্পূর্ণ নীরব থাকার জীবনপণ শপথ গ্রহণ করলেন। স্থানীয় লোকদের সন্দেহ দূর করার জন্য তাঁরা অনুসন্ধান কাজ থামালেন না। নির্বিচারে অন্য অনেকগুলি শিশুকে পরীক্ষা করলেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মরণ রাখা দরকার এই অনুসন্ধান কার্য চীন অধিকৃত অঞ্চলে করা হচ্ছিল, সেই কারণেই এত সতর্কতায় প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তী দালাই লামাকে খুঁজে পাওয়া গেছে একথা প্রচারিত হলে চীন সরকার হয়তো দালাই লামাকে পথে পাহারা দেবার অজুহাতে এক বিরাট সেনাবাহিনী লাসায় পাঠাতো। লামারা বালকটিকে

লাসায় নিয়ে যাবার জন্যে প্রদেশ সরকার মা-পুফাঙ-এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁরা কেবল জানালেন লাসায় অন্য আরো অনেক বালকের মধ্যে দালাই লামা নির্বাচনের ব্যাপারে একেও পরীক্ষা করা হবে। মা-পুফাঙ বালকটির জন্য একলক্ষ চৈনিক টাকা দাবী করলেন। সে টাকা তৎক্ষণাৎ জমা করে দেওয়া হোল। এক কথায় এই টাকা জমা করাই লামাদের পক্ষে এক চরম ভুল প্রমাণিত হয়। তিব্বতীয়দের কাছে এই বালকের গুরুত্ব অনুমান করে প্রদেশ সরকার পুনরায় আলাদা তিন লক্ষ টাকা দাবী করলেন। তাঁরা সামান্য কিছু টাকা কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে ধার নিয়ে সরকারকে জমা দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন লাসায় পৌছে বাকী টাকা পাঠাবেন। রাজ্যপাল এই ব্যবস্থায় রাজী হলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে চারজন অনুসন্ধানকারী লামা তাঁদের চাকর, অর্থপ্রদানকারী ব্যবসায়ীরা এবং সেই পবিত্র বালক ও তাঁর পরিবারবর্গের সকলে লাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তার পরের ঘটনা সাক্ষাৎকারী চতুর্দশ দালাই লামা নিজ মুখে যেভাবে বলেছিলেন এখানে তা উল্লেখ করা হল ঃ

"তিব্বত সীমান্তে পৌছতে আমাদের কয়েক মাস কেটে গেল। একজন রাজমন্ত্রী অন্য সদস্যদের সঙ্গে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি রাজার স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি আমাদের দলনেতাকে দেন। সেই চিঠিতে আমাকে দালাই লামা হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই প্রথম আমি দালাই লামা নামে প্রচারিত হলাম এবং অভিবাদন পেলাম। আমার পিতা-মাতা যদিও ধারণা করতে পেরেছিলেন আমি জন্মান্তরিত কোন বড় সাধু সন্ন্যাসী কিন্তু কেবলমাত্র তখনই জানতে পারলেন তাঁদের সন্তান বর্তমান তিব্বতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্তা।..."

"আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমাকে একটি মূল্যবান সোনার পালঙ্কে বসিয়ে লাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কখনও এত লোকজন দেখি নি। আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে

সমস্ত শহর সেদিন রাস্তায় ভেঙ্গে পড়েছিল। আমার পূর্ববর্তী দালাই লামা দেহত্যাগের পর প্রায় ছ' বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়াতে সমস্ত দেশবাসী তাদের ধর্মনেতার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিল। ·····

"১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারীতে পুণ্য নববর্ষ উৎসবের সময় 'দালাই লামা' হিসেবে লাসায় আমার অভিষেক হয়। এই সময়ে আমাকে 'পবিত্রতম', 'করুণাময়', 'মহিমাময়',—'সর্বোত্তম', 'অখণ্ডজ্ঞানী', 'পরিত্রাতা' ও 'অসীম জলধি' ইত্যাদি নানা নূতন নামে ভূষিত করা হয়।

"অভিষেক অনুষ্ঠানের কার্য্যকাল বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছিল। আমি অবিচলিত ভাবে সব করণীয় আচার আচরণে অংশ নিয়েছিলাম। আমার সেই গাম্ভীর্য ও নিস্পৃহতায় উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী দালাই লামার খাস চাকরদের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই আমি এমন ব্যবহার করেছিলাম যেন তাঁদের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর।"

চতুর্দশ দালাই লামার নির্বাচনের সম্পূর্ণ কাহিনী শোনার পর এ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য ও বিশ্বাস সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করা হলে তিনি জানালেন যে, "আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, তাঁর সেই শিশুকালে তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসার অনেক লোককে সনাক্ত করতে পারতেন। দালাই লামা হিসেবে যে বালককে নির্বাচন করা হয় তাঁকে এই জিনিস-পত্র ও লোক চেনার ব্যাপারে কঠোরতম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। তিনি জানালেন তাঁকেও এই সকল পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে এবং প্রতি-ক্ষেত্রে সফল হবার পর তবেই তাঁকে ত্রয়োদশ দালাই লামা থুমটেন গ্যাটসোর স্থানে মনোনীত করা হয়।"

তিব্বতের পুনর্জন্মের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দালাই লামা জানালেন, "তিব্বতের ধর্মে দু'ধরণের পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ আছে। সাধারণ

ও নিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্ম। প্রথম ক্ষেত্রে মৃত আত্মার পরবর্তী জন্মের মাধ্যম নির্বাচনের কোনই ক্ষমতা থাকে না কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আত্মা নিজের পছন্দতম পরিবেশ ও মাধ্যমের মাঝে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। উন্নত শ্রেণীর আত্মাই জন্মান্তরেই নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। বহু লামা (তিব্বতীয় ধর্মযাজক) এই নিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্মের রীতিতে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

চতুর্দশ দালাই লামা জানালেন, "তিনি নিজে এমন অনেক ঘটনা দেখেছেন অথবা জানেন।"

সাধারণভাবে তিব্বতীরা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ জনসাধারণের রক্ষার্থে ও পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে বারংবার দালাই লামা রূপ ধারণ করে জন্ম নেন। চতুর্দশ দালাই লামা নিজের ক্ষেত্রে এই সনাতন বিশ্বাসের পরিপন্থী মতবাদ পোষণা করেন। তাঁর মতে তিনি বোধহয় ত্রয়োদশ দালাই লামার জন্মান্তরিত প্রতিভূ নন এবং সে কারণেই তাঁর ধারণা তিনি বুদ্ধ অবতার নন। তবে তিনি পূর্ববর্তী দালাই লামার প্রতিনিধিমূলক কোন উচ্চস্তরের আত্মার মানবরূপ। এটা নিয়ন্ত্রিত জন্মান্তর পদ্ধতিতে সম্ভব হয়ে থাকবে। বর্তমান দালাই লামা বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের সূত্র সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর সঙ্গেই ছিন্ন হয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রিত পুনর্জন্মের পদ্ধতি পুরোবর্তী দালাই লামারা মানবাত্মার শেষ জন্মগ্রহণের বা নির্বাণ লাভের (অখণ্ড পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া) প্রাথমিক পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করেছিলেন বলে আধুনিক দালাই লামা ব্যক্ত করলেন।

সংক্ষিপ্ত পরামনস্তত্ত্বাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে দলাই লামার এই ইতিহাস ও তিব্বতের ধর্মগত এবং জন্মান্তরের পদ্ধতির এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষকরা সমস্ত ঘটনাকে হয়তো কাকতালীয় এবং বিভ্রান্তিকর বুজরুকি বলে ঘোষণা করতে পারেন।

পরামনোবিদ্যার গবেষকরা মোটামুটিভাবে বিশ্বাস করেন তিব্বতীয় জন্মান্তরবাদ ও ধর্ম আচরণের ন্যায় অন্যান্য অল্প খ্যাত, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জীবনযাত্রা পরামনোস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ণে মহত্ত্বপূর্ণ নূতন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারে। এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই করা হয়েছিল। দালাই লামা যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিব্বতীয় ধর্মের এই সকল বিশ্বাস ও কিংবদন্তীকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন তথাপি এই বিশ্বাসের বিজ্ঞানভিত্তিক যাচাই হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীয়দের মধ্যে অতিমনের অধিকারী ব্যক্তিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 'ইনষ্টিটিউট অব টিবেটিয়ান প্যারা-সাইকোলজি' নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বাসনা জানান। তিনি নিজে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন জানালেন।

পরিকল্পনাটি কার্যকর হলে আমরা অদূর ভবিষ্যতে তিব্বতীয় ধর্মের বিচিত্র বিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে কুহেলিকাময় রহস্যের সমাধান পাব এবং সব কিছুই একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্য সাঁই বাবা

রহস্য ও রোমাঞ্চের প্রতি আমাদের একটি সহজাত আকর্ষণ আছে বলেই অতি সহজে আমরা অলৌকিক সব কিছুই বিশ্বাস করে নিই। কিন্তু সেই সব কাহিনীগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেগুলি আরোপিত অর্দ্ধসত্য বা কারচুপির ব্যাপার। তবে তার মধ্যেই কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না বলেই পরামনোবিজ্ঞান তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করতে এগিয়ে আসে।

পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে সত্য সাঁই বাবা (এখন থেকে আমরা এই প্রবন্ধে সির্দির সাঁই বাবার" সঙ্গে আলাদা বোঝানোর জন্য শুধু "সত্য বাবা" বলবো) বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য গবেষণার

পাত্র। জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম নিয়ে পরামনোবিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই গবেষণা করছেন এবং সত্যবাবার দাবী—আমি সির্দির সাঁই বাবার জন্মান্তরিত সত্তা' তাঁকে পরামনোবিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলে। আত্মার দেহান্তর ঘটা যে সম্ভব তা আমাদের শাস্ত্রে ও ধর্মে সম্মতি পেয়েছে। বিজ্ঞান সে বিশ্বাসকেই সত্য প্রমাণিত করতে চায়।

অলৌকিক সাধু

এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত সংবাদ পত্রে সত্য বাবাকে এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি নিজেকে সির্দির (পুণার কাছের এক অঞ্চল) সাঁই বাবার দ্বিতীয় জন্ম বলেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকেদের তু'রকমের ধারণাই রয়েছে—কেউ কেউ তাঁকে 'অলৌকিক মহাত্মা' হিসাবে শ্রদ্ধা করেন, অনেকে অবিশ্বাসের যুক্তিতে সমালোচনাও করে থাকেন। সত্য বাবা এবং সাঁই বাবা এই তুজনের বিস্তৃত জীবনী আলোচনা করলে আমাদের বোধ হয় নিজেদের সঠিক সিদ্ধান্তের সুবিধা হবে ঃ

সির্দির সাঁই বাবা প্রথম যখন সির্দিতে আসেন তখন তাঁর বয়স ষোল বছর—সেটা ১৮৭২ সালের ঘটনা। তদানীন্তন হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছাড়া তাঁর বাল্য জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত তাঁর বাবা মা ছেলেবেলায় মারা গিয়ে থাকবেন কারণ সাঁই বাবা নিতান্ত বাল্য বয়সে এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানোর পর তিনি পাকাপাকি ভাবে ১৮৭৩ সালে সির্দিতে ঘর বাঁধেন এবং ১৯১৮তে তাঁর দেহত্যাগের সময় অবধি সেখানেই ছিলেন। জীবনের এই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তের সংখ্যা দিনের পর দিন নিরন্তর বেড়েই গেছে। তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল তিনি বহুজন-শ্রদ্ধেয় সন্ত হিসেবে প্রখ্যাত হয়েছেন।

সাঁই বাবার জীবনের কতকগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। ভক্তের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা তুলনাবিহীন ছিল। তাদেরকে বিপদ-আপদ ও দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিতে তিনি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। শোনা গেছে প্রায়ই তিনি ভক্তদের কাছে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাদের দুঃখ বেদনায় সান্ত্বনা দিয়েছেন। শেষ বয়সের দিকে তাঁর আশ্রমে জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দলে দলে লোক এসেছে বিভিন্ন দাবী ও বাসনা নিয়ে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জাগতিক সুখ সুবিধা সমৃদ্ধি ও উন্নতির কামনায়)। তিনি কাউকে নিরাশ করেন নি, কল্পতরুর মতই সকলের ইচ্ছাপূরণ করেছেন। এই জাগতিক সুখ সুবিধা বিতরণের পেছনে তাঁর নিজের একটা মহৎ বাসনা ছিল, তিনি চাইতেন যে তাঁর ভক্তেরা যেন ক্রমশ অধ্যাত্ম মার্গে এগোতে পারে। এ সম্পর্কে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, "লোকেরা যা চায় আমি তাদের তাই দিই এই ভেবে যে একদিন আমি যা দিতে চাইবো তখন তারা তা সাগ্রহে নেবে।"

তাঁর কাছে মুখ ফুটে কিছু উচ্চারণ করার আগেই তিনি প্রার্থীর দাবা পূরণ করে দিতেন। তাঁর ভক্তেরা এতে অত্যন্ত বিস্মিত হত এবং তাকে অন্তর্যামী বলে বিশ্বাস করতো। তাঁর করুণায় অসুস্থ নীরোগ হয়েছে, নিঃসন্তান সন্তান লাভ করেছে, বহু নাস্তিক পরম ঈশ্বরপ্রেমিক হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। কোন এক বিশেষ সময়ে সির্দিতে উপস্থিত থেকেও তিনি দূরদূরান্তে ভক্তদের প্রয়োজনে তাদের কাছে অবিকল শরীরী চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছেন।

এইদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় সাঁই বাবার চরিত্রের এই প্রকাশের সঙ্গে যে কোন উচ্চ মার্গের সাধুর সঙ্গে সঙ্গতি মেলে এবং ঘটনায় যা প্রকাশ তা থেকে আমরা জানতে পারি সির্দির সাঁই বাবা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সাধু ছিলেন। কিন্তু সাধারণ সাধুরা যেখানে ভগবৎপ্রেম ও পূজা অর্চনায় বিভোর থাকে সেক্ষেত্রে

সাঁই বাবার নিরন্তর এই অলোকিক অনুষ্ঠান অনেককেই ভাবিত করেছে। এই ভাবেই এক কর্মবহুল জীবন কাটানোর পর সাঁই বাবা ১৯১৮ সালে স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২৬ সালের ২৩শে নভেম্বরে পুট্টাপরথী গ্রামে (বাঙ্গালোরের কাছে) একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। ছেলেটির নাম রাখা হয সত্যনারায়ণ রাজু। শোনা যায় ছেলেটি ছেলেবেলা থেকেই নানান আশ্চর্য কাজে-কর্মে গ্রামবাসীদের বিস্মিত করেছিল। ঘটনায় প্রকাশ, চোদ্দ বছর বয়সের সময় ছেলেটি একদিন গ্রামবাসীদের জমায়েতে সকলের সামনে একটা অলৌকিক কাজ করে ; কেবলমাত্র শূন্য হাত হাওযায় আন্দোলিত করে সে ফল ও মিষ্টি উপস্থিত করে এবং সকলকে বিলি করে দেয। সেই সভাতেই স্বাভাবিকভাবেই সে ঘোষণা করে, "আমি সির্দির সাঁই বাবা পুনরায জন্ম নিয়েছি।" অত্যন্ত পরিচিতের মত সে সির্দির সাঁই বাবার কাহিনী জানায়, সির্দির বহু বিষয়ের উল্লেখ করে এবং মৃত সাধুর অন্তরঙ্গ বিশেষ কয়েকজনের নামও বলে।

সাঁই বাবার পুনর্জন্মের দাবী করার পর থেকেই সত্যনারায়ণ রাজুকে সকলে সত্য সাঁই বাবা নামে ডাকতে আরম্ভ করে। তিনি নিজের পরিবারের আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে একটি মন্দিরে থাকতে লাগলেন। গ্রামবাসীদের কাছে সেই প্রথম অলৌকিক উপায়ে মিষ্টি ও ফুল তৈরী করার অভ্যাস তাঁর আজও অব্যাহত আছে। শুধু পার্থক্যের মধ্যে এখন তিনি খুশীমত যা ইচ্ছে তাই তৈরী করেন—মূল্যবান ঘড়ি, গহনা, দেবদেবীর বিগ্রহ, বিভূতি প্রভৃতি। তাঁর এই অপ্রাকৃত ক্রিয়ার অন্য দিকও আছে—পুট্টাপরথীতে উপস্থিত থেকে পূর্বের বাবার মতই তিনি অন্য ব্যক্তির কাছে দূর দূরান্তরে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

প্রতি দিন হাজার হাজার ভক্ত তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয় বহু দাবী ও বাসনা নিয়ে; তিনি তাদের সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন, অন্ধকে চক্ষুদান করেন, সন্তানহীনাকে সন্তান, স্বল্পায়ুকে দীর্ঘ জীবন

দেন। ভক্তদের তিনি এত নিবিড়ভাবে ভালবাসেন যে প্রায়ই তাদের কষ্ট ও দুঃখ নিজের দেহে ধারণ করেন। কখনো কখনো তিনি নিজে 'হার্ট এ্যাটাকের ষ্ট্রোক' তাঁর শরীরে গ্রহণ করেন তাঁর কোন ভক্তকে নীরোগ করার জন্যে—সে হয়তো সেই 'ষ্ট্রোক' সামলে উঠতে পারতো না এবং সম্ভবত মারা যেতো। তাঁর কাছে যারা আসে তাদের তিনি পরিষ্কার পড়তে পারেন এবং তারা প্রশ্ন করার আগেই সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে দেন। একথাও শোনা যায় যে তিনি ভক্তদের স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাদের দুঃখ ও সমস্যা দূর করে দেন।

দুই বাবার জীবন তুলনা করলে দেখা যায় চরিত্রের ও স্বভাবে কয়েকটি বিষয়ে এদের আশ্চর্য মিল রয়েছে। দু'জনেই অলৌকিক ক্রিযার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সাধারণত সাধু-সন্তদের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অলৌকিক (কিংবা ঐশ্বরিক!) ক্ষমতার অধিকারী হন কিন্তু তাঁরা সে ক্ষমতা সহজে প্রকাশ করেন না। কিন্তু এখানে দুই বাবাই ভক্তদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কিছুটা জোর করেই প্রায় বারবার অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়ে থাকেন। এবং এঁরা দুজনেই অন্যের মনের কথা হুবহু জানতে পারেন কিংবা স্বপ্নে দেখা দেন।

অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমশ বিকাশ ঘটিয়ে সকলের উন্নতি সাধনের আগ্রহের এই সাম্যতা দুই বাবার এক হলেও এঁদের কিছু কিছু অমিল আছে। সির্দির সাঁই বাবা অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়েছিলেন। পুট্টাপরথীতে বাবা বিলাসের মধ্যে থাকেন। অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞায় এর ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এই যে যে সব সন্ত প্রারম্ভ কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি যখন পরবর্তী জীবনে উচ্চস্তরে পৌছান তখন সে অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই ত্যাগ করে থাকেন। উইলিয়াম জেমস এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ভ্যারাইটিস্ অব রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্স' গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রকৃত উচ্চস্তরের

সাধুরা ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করে থাকেন তখন তাঁরা দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না।” সত্য বাবার জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপনকে এদিক থেকে বিচার করলে আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি সির্দির সাঁই বাবার থেকেও আধ্যাত্মিক পথে হয়তো আরো অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, সত্য বাবার মত কোন ঘটনায় আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মিশ্রিত ভাবনার জন্ম হয়। ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা দরকার এবং তার পরেই কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যেতে পারে। কিন্তু এ ঘটনার ক্ষেত্রে গবেষণা করার অসুবিধে রয়েছে কারণ সত্য বাবাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অনুমতি কেউই দেবেন না। এক্ষেত্রে পরামনোবিজ্ঞানীকে সিদ্ধান্তের জন্য বিভিন্ন ঘটনা, জনশ্রুতি, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের বাবার সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিচার করে দেখতে হয়।

আমরা সকলেই জানি মানব স্মৃতি পূর্ব অর্জিত জ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল। অর্থাৎ কেউ যদি একটা কবিতা মুখস্থ বলে তাহলে ধরে নিতে হবে যে অতীতে কোন না কোন সময়ে সে কবিতাটি পাঠ করেছে। এই সূত্রটি সত্য বাবার ক্ষেত্রে লাগিয়ে আমরা দেখতে পারি যে সত্যনারায়ণ রাজু ছেলেটির সির্দির সাঁই বাবার উত্তর পুরুষ বলে দাবী করার আগে তার পক্ষে পূর্ববর্তী বাবার জীবনের ঘটনা জানার কোন অবকাশ হয়েছিল কিনা। খবর যা পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় তেমন কোন সুযোগ ছিল না তার। সত্যনারায়ণ রাজু সাঁই বাবার ঘটনা জানা তো দূরে থাক আদৌ তাঁর নাম শুনেছিল কিনা সন্দেহ। পুট্টাপরথী থেকে সির্দির দূরত্ব যথেষ্ট, তাছাড়া ভাষারও ব্যবধান ছিল—সির্দির মারাঠী ভাষার প্রচলন এবং পুট্টাপরথীতে তেলেগু। খবর নিয়ে দেখা গিয়েছিল পুট্টাপরথী গ্রামের কেউই সির্দির সাঁই বাবার নাম শোনেনি। এসব তথ্য ও খবর সত্য হলে সত্যনারায়ণের সির্দির সাঁই বাবার সংবাদ বিশদভাবে জানতে পবার কোন সঙ্গত যুক্তি আমরা দিতে পারি না।

সির্দির সাঁই বাবার জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেওয়া ছাড়াও সত্য বাবা পূর্বের বাবার ভক্তদের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলতেন। ভক্তদের সম্পর্কে তাঁর কথাবার্তার ধরণ অবিকল আগের বাবার মত ছিল। কয়েক বছর আগে তিনি সাঁই বাবার একজন পুরোনো ভক্তকে মার্কারাতে চিনতেও পারেন। এছাড়া সত্য বাবা মুসলমান ধর্ম ও মসজিদের রীতিনীতি ইত্যাদিতে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন সেই বাল্য বয়সেই। একটি গ্রামের ছেলের পক্ষে, বিশেষত যেখানে অন্য ধর্মের আলোচনাও অপরাধ বলে গণ্য হত সেখানে এধরণের জ্ঞান থাকা বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সির্দির সাঁই বাবা এক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে ছিলেন।

দুই বাবার চরিত্রের কিছু কিছু লক্ষণ তুলনা করে এক দেখা গেছে এবং সত্য বাবার পূর্বের ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিস ও তাঁর পরিচিত লোকজনদের চিনতে পারা এবং উপরে বর্ণিত অন্য সব ঘটনা ইত্যাদি থেকে আমাদের সত্য বাবার পুনর্জন্মের দাবী প্রকৃত বলে প্রাথমিকভাবে মেনে নিতে হয়। তবে পূর্ণতার প্রমাণের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক যাচাই করার দরকার রয়েছে এবং যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন কিছু কিছু অবিশ্বাসী লোকেদের সন্দেহের প্রত্যুত্তর সঠিকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে দেওয়া মুস্কিল। এপ্রসঙ্গে পরামনো-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে আমরা অন্য কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ এখানে করতে পারি।

বিজ্ঞান সচেতন অথচ ধর্মে বিশ্বাসীদের মত হল—অলৌকিক কার্যকরণ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতধর্মী সূত্রে নিয়ন্ত্রণাধীন (Contrary wise to the laws of Nature)। এর সপক্ষে দুটি যুক্তি রয়েছে: এক, আমাদের জানা প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরেও প্রচুর নিয়ম থাকতে পারে। দুই, আমাদের তথাকথিত সমস্ত নিয়ম পূর্ব অভিজ্ঞতার থেকে ক্রমশঃ আবির্ভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তির তথ্যের ওপর নির্ভর করে

নিয়মগুলি ক্রমশ স্বীকৃতি পেয়েছে। কিছু কিছু কারণে অতীতে একই মাত্রায় এক বিশেষ ফল পাওয়া গেছে বলে আমরা ধরে নিয়েছি যে বরাবর ভবিষ্যতেও অনাদিকাল ধরে তাই ঘটবে। অথচ কখনো কখনো তা নাও হতে পারে। প্রকৃতি যত না নিয়মানুগ আমরা তাকে তার থেকেই বেশী নিয়মানুবর্তী হিসেবে ভেবে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ক্রমশ সময়ের ব্যবধানে আমাদের অভিজ্ঞতার ও তা থেকে নিয়মের পরিধি যখন বিস্তৃতি হবে তখন দেখা যাবে আজকের অনেক অলৌকিক ঘটনা সেদিন 'প্রাকৃতিক নিয়ম' হিসেবে মান্যতা পাচ্ছে। এই মতাবলম্বীদের ধারণায় সত্য বাবার আজকের 'অলৌকিক' কাজগুলিকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে কারণ এ ঘটনাগুলি আজ প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় না পড়লেও আগামীকাল পড়তে পারে।

ভারতীয় যোগশাস্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন, উপযুক্ত যোগাভ্যাসের ফলে কিছু কিছু 'অসাধারণ কাজ' করা সম্ভব। সত্য বাবার অলৌকিক কাজগুলি সম্পর্কে তাঁদের যুক্তি হল যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমের ফলে মনের শক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মনের ক্ষমতা সীমাহীন কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির মন বিভিন্ন চিন্তার সতত ভারাক্রান্ত বলে তার শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। কেউ যদি মনের এই অদম্য শক্তিকে বশীভূত করতে পারে তাহলে তার সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে—অর্থাৎ অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা জন্মায়। তাঁদের মতে সত্য বাবা মনকে বশীভূত করে সমস্ত সিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। অধ্যাত্মবাদীদের মতে সত্য বাবার মন বিশেষ উচ্চস্তরের বলেই তা অন্তর্মুখী হতে পারে এবং ব্যক্তি সত্তা হারিয়ে অখণ্ড ব্রহ্মে মিলিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, "সাধুরা অলৌকিক কিছু করে না; ঈশ্বর তাদের দ্বারা সেগুলো করান।" এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা চলে সত্য বাবার ঘটনাগুলি সেই অখণ্ড শক্তির লীলা খেলার প্রকাশ মাত্র।

যারা সন্দিহান তাঁরা সত্য বাবার অলৌকিকত্বকে সাজানো

ব্যাপার ('make-believe') বলে মনে করেন। তাঁদের মতে যেহেতু তাঁর ভক্তেরা ঐ ধরণের অলৌকিক কিছু একটার জন্যে মনে মনে আগেই তৈরী থাকে সেইহেতু বলে সামান্য ইঙ্গিতও সেখানে বিশেষ কার্যকরী হতে পারে। এধরনের মানসিক অবস্থায় দর্শককে যা কিছুই বলা হোক না কেন সে তাই দেখতে থাকবে বা বিশ্বাস করবে।

ড হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রসঙ্গে বলতে চান যে নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক যাচাইয়ের অনুপস্থিতে শুধুমাত্র লোক পরম্পরায় যে অল্প তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে চলে না যে তিনি জন্মান্তরে সিদির সাঁই বাবা। তবে তিনি জানান যে, যে সমস্ত উদাহরণ, তথ্য ও লোকশ্রুতি রয়েছে সেগুলিকে মিথ্যাও বলা চলে না—সেগুলি সবই পরামনোবিজ্ঞানের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সত্য বাবার দাবীকে সত্য প্রমাণ করতে পারে। কারণ তাঁর বিভিন্ন ঘটনাগুলি টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স, প্রিকগনিশন ইত্যাদি সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং এই মানসিক ক্রিয়াগুলিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সত্য বলে নির্ধারণ করা হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্য বাবার কোন দাবীকে বলতে মিথ্যা চান না বরঞ্চ সত্য বলেই সম্ভব মনে করেন। তাছাড়া তাঁর মতে কোন সাধু বা মহাত্মাকে তাঁর অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে বিচার করা অন্যায়—দেখা দরকার শিক্ষিত যুক্তিবাদী ব্যক্তির মনে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভাবনা কোন ছাপ ফেলতে পারে কিনা। সেদিক থেকে দেখলে বলা যেতে পারে সত্য বাবার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় তাঁর অগণিত শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভক্তেরা উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত।

ভক্তের চোখে সত্য সাঁই বাবা

সত্য সাঁই বাবা সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বলে সত্য বাবার প্রতি তাঁর ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তার কোন উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। নীচের প্রবন্ধটি থেকে আমরা গুরু ভক্তের উপরে কি প্রভাব

রাখেন তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ চিত্র পাবো বলে মনে করি। প্রবন্ধটি ডাঃ এস ভগবান্তম, ডি এস সি ; এফ এন. আই ; ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন বিজ্ঞান উপদেষ্টার লেখা এবং 'ভবন'স জার্ণাল (নভেম্বর ২৮, ১৯১৫) পত্রিকার সৌজন্যে এখানে মুদ্রিত হল ঃ

"আমি একদা প্রায় নাস্তিক ছিলাম, আমার শিক্ষা, পরিবেশ, যুক্তিবাদী মন ও প্রশিক্ষণ আমাকে সে ভাবেই গড়ে তুলেছিল। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে শ্রীবাবার সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয়। আমি সে সময়ে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যক্ষ। আমার এক বয়স্ক আত্মীয় টেলিফোন করে আমাকে জানালেন যে তিনি বর্তমানে এক মহান্ ব্যক্তির সঙ্গে একটা ছোট বাড়ীতে রয়েছেন এবং সেখানে থাকার কিছু অসুবিধে হচ্ছে। আমি তাঁকে আমার বাড়ীতে থাকতে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি জানালেন যে, যাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার এই আত্মীয়টিও প্রায় নাস্তিক এবং কাউকে বড় একটা পরোয়া করেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে কাজ করেন না, তখন সে ব্যক্তিটিকে তো একবার দেখতে হচ্ছে। সেই সূত্রেই আমার শ্রীবাবার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। অন্য যে কোন সাধারণ লোকের সঙ্গে আমি যেভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত আমি তাঁর সঙ্গে সেদিন সেভাবে কথা বলি। এর পরে আমি আমার আত্মীয়কে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। বাবা বললেন, তিনিও আমার বাড়ীতে আসবেন। আমি নিতান্তই নাস্তিকের মত আচরণ করেছিলাম। অন্যেরা তাঁকে দেখলেই পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে। আমি হাত তুলে 'নমস্কার' পর্যন্ত করিনি। আমার এই আশ্চর্য ব্যবহারে বাবা হয়তো মনে মনে হেসে থাকবেন।···

বছর খানেক বাদে একদিন ঘটনাক্রমে আমি আমার সেই আত্মীয় ও বাবা চিত্রাবতী নদীর তীরে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। বাবা বললেন, 'আমরা কি একটু বসবো

এখানে।' আমি উত্তর দিলাম, 'আপনার যেমন অভিরুচি।' বাবা বললেন, 'না, তুমি যদি বল তাহলে বসবো এবং যেখানে বলবে সেখানেই বসবো।' আমি একটু বিস্মিত হলাম, কেন তিনি আমাকে দিয়ে বসবার জায়গা নির্বাচন করাতে চান ভেবে। শেষে আমরা সকলে আমার পছন্দ মত এক জায়গায় বালির উপর বসলাম। আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য প্রায় শ' খানেক অন্য ভক্তেরাও ছিলেন। বাবা আমাকে বলতে লাগলেন যে, বিজ্ঞানীরা জীবনের আংশিক সত্যকে কেবল দেখে থাকে এবং যা কিছু প্রমাণযোগ্য তা ছাড়া অন্য কিছু জানতে চায় না। তিনি আমাদের মারণাস্ত্র তৈরী করার জন্য দায়ী করলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ 'তুমি ভগবান বিশ্বাস করো? ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুমি মানো?' আমি খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, উত্তর দিলাম, 'বিজ্ঞানী হলেই যে ভগবান মানবে না এমন কথা তো নেই। অনেক অবৈজ্ঞানিক লোকেরাও রয়েছে যারা ভগবান বিশ্বাস করে না। আমি ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। আমার বাপ-ঠাকুর্দারা সকলেই সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁরাও এ ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করেছেন।....

"বাবা আমাকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ভগবৎ গীতায় বিশ্বাস করো? আমি যদি তোমাকে একটা গীতা দিই তুমি পড়বে?' আমি বললাম, 'রোজ পড়বো এমন মিথ্যা দাবী করবো না তবে আমার সংগ্রহের ভাণ্ডারে সযত্নে রেখে দেবো।' বাবা বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে হাত পাতো।' তিনি নদীর পাড় থেকে একমুঠো বালি তুলে নিলেন এবং আমার হাতে দিলেন। আমি বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম আমার হাতের বালি ধীরে ধীরে ছোট একটা 'ভগবৎ গীতা'য় পরিণত হল। আমি একজন যুক্তিবাদী, প্রায় নাস্তিক লোক, আমার সে সময়ের মনের অবস্থা একবার কল্পনা করুন। প্রমাণ ছাড়া আমি কোনদিন কিছু মেনে নিইনি। আমি মনে ভাবলাম ছাপা বই যখন তখন নিশ্চয় প্রেসের নাম ও-

কোথায় ছাপা হয়েছে তা থাকবে। কিন্তু সে সব কিছু উল্লেখ নেই দেখে হতচকিত হয়ে বাবাকে প্রশ্ন করলাম, 'বইটা কোথায় ছাপা হয়েছে?' বাবা নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন, 'সাঁই প্রেসে ছাপা হয়েছে, তোমার পড়তে সুবিধে হবে বলে আমি তেলেগু অক্ষরে ছাপার ব্যবস্থা করেছি।' সে রাত্রিতে বাবা আরো অনেকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ হতবাক। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সে সব সম্পর্কে আমি কি মতামত জানাতে চাই। বাবা ভাল করে জানতেন আমি এ সব বিশ্বাস করি না। তাই তিনি আমাকে দিয়েই বসবার জায়গা নির্বাচন করিয়েছিলেন। তিনি নিজে জায়গা নির্বাচন করে বসলে আমি হয়তো বলে বসতাম যে আগে থেকে বালীর তলায় ভগবৎ গীতা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।...

"আর একবার আমরা সমুদ্রের তীরে বসে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে কেরালার প্রাক্তন রাজ্যপাল বি, রামকৃষ্ণ রাও ও বাবার জনা বারো ভক্ত ছিলেন। ছেলে মানুষের মত বাবা ঢেউ নিয়ে খেলা করছিলেন। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'সমুদ্রের কতগুলো নাম বলতে পারি আমরা। কেউ বললেন, 'রত্নগর্ভা' কেউ বললেন 'রত্নাকর'। বাবা মন্তব্য করলেন, 'রত্নাকর যদি হয় তাহলে আমাদের রত্ন দিক দেখি।' আমি বাবার কাছেই ছিলাম, বললাম, 'আপনি ইচ্ছে করলেই দেবে।' বাবা আমার দিকে মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসা ঢেউ থেকে একটু জল তুলে নিলেন এবং মুহূর্তে দেখি তাঁর হাতে হীরার একছড়া হার। আমার মনের সে সময়ে অবস্থা ছিল, হয় এসবের একটা সঙ্গত উত্তর খুঁজে বার করবো না হলে তাঁর চরণে মাথা নত করবো। আমার কাছে সে এক চরম মুহূর্ত। হারটা খু ছোট আকারের এবং বাবার মাথা দিয়ে গলান সম্ভব হবে বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা নিয়ে কি করা যেতে প' আমি সমস্যাটা জটিল করার উদ্দেশ্য বললাম, 'বাবা আ' এটাকে সৃষ্টি করেছেন তখন আপনিই গলায় পরুন।'

আমাকে বললেন, 'তুমি আমাকে মুশকিলে ফেলতে চাইছো তো!' তিনি হারটা সামান্য একটু টানতেই তা বেড়ে গেল এবং অনায়াসে তিনি মাথায় গলিয়ে পরে নিলেন। আমার দিকে আবার ফিরে বললেন, 'এ ঘটনা সম্পর্কে তোমার কিছু বলার আছে কি ?...'

"না, আমার কিছুই বলার ছিল না। যদি বলতাম বাবা যাদুবিদ্যার ভেল্কি দেখিয়ে হারটা কোন লুকান জায়গা থেকে এনেছেন তাহলে তার থেকে বড় অন্যায় আর কিছু হত না। আমি তাঁকে যে সমস্যায় ফেলতে চেয়েছিলাম তিনি তা চোখের পলকে সমাধান করে দিলেন। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, আমার মনের মধ্যে যখন কোন প্রশ্নের আবর্ত উঠেছে বাবা কোন না কোন ঘটনা তৈরী করে তার সমাধান বাতলেছেন।....

"একবার এক মহাশিবরাত্রির দিনে আমি প্রশান্তি নিলয়মে (বাবার আশ্রম) দাঁড়িয়েছিলাম। হাজার হাজার লোক এই ছোট গ্রামে এসে জমা হয়েছে। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, যুবক, বৃদ্ধ সব ধরণের লোকের ভিড় ; তাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে যারা বাবার এই অলৌকিক ক্রিয়াকে তামাসা মনে করে কিম্বা ভাবে তাঁর চালাকি ফাঁস করে দিতে পারবে। আমি ভাবছিলাম, এত কষ্ট সহ্য করে কেন আজ এত লোক এখানে এসেছে ? এদের অনেকেই তো বম্বে কিম্বা দিল্লীর বিলাসবহুল হোটেলে থাকতে পারতো কিন্তু এখানে প্রশান্তি নিলয়মের গাছের তলায় কম্বল বিছিয়েছে। এ সব কথাই ভাবছি হঠাৎ বাবাকে আসতে দেখলাম। আমার কাছে এসে পৌছতে তাঁকে আমি নমস্কার জানালাম, উত্তরে বাবা হঠাৎ বললেন, 'আমিও জানি না কেন এত ধনী ও মানী লোকেরা এখানে কষ্ট সহ্য করতে আসে!' আমি যা ভাবছিলাম বাবা তাই পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু তখনও আমার নিজের পুরো-পুরি অবিশ্বাস যায়নি—আমি জিনিসটা কাজতালীয় মনে করেছিলাম।...

"একবার আমি ও এক নবওয়েবাসী ভদ্রলোক আশ্রমের একই

ঘরে ছিলাম। মহাভিষেকের পূজা উপলক্ষ্যে বাবা সির্দির সাঁইনাথের বিগ্রহটি একটি চৌকিতে প্রতিষ্ঠা করলেন। একটা কাঠের খালি পাত্রে বাবা হাত নেড়ে প্রচুর বিভূতি (পূতঃ ভস্ম) তৈরী করে বিগ্রহের উপরে ছড়ালেন। শেষে কি ইচ্ছে হতে বাতাসে হাত নেড়ে একটি বড় পান্না তৈরী করে সেটি বিগ্রহের কপালে আটকে দিলেন। আমি ও আমার সেই নরওয়েবাসী বন্ধু ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দশ গজ দূরে আমাদের ঘরে বসে আলোচনা করছিলাম পান্নাটি কি করে বিগ্রহের ধাতব গাত্রে আটকে গেল? আপনা থেকে? সেদিন বিকেলে এক আলোচনা সভায় সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ থেমে বাবা জানালেন যে, অনেকেই পান্নাটি বিগ্রহের কপালে কি করে আটকে গেল তা নিয়ে ভেবে আকুল হয়েছে'। কিন্তু যে শক্তি পান্নাটিকে তৈরী করতে পারে সে খুশিমত যেখানে ইচ্ছে সেটাকে লাগাতেও পারে। আমাদের ঘরে বসে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম বাবা তা জানলেন কি করে? পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা ধরে এমন বহু ঘটনা সে বারে ঘটে ছিল যেগুলোকে কাকতালীয় বলা সম্ভব নয়।··

"আমি অনুভব করতে সুরু করেছিলাম যে, আমাদের পরিচিত পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার সূত্রে ঘটনাগুলোকে বিচার করা না গেলেও এগুলোকে আমায় স্বীকার করে নিতে হবে। আমি যা দেখেছি তা যুক্তি-তর্ক-আইন বা নিয়মের সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই অলৌকিক ঘটনা একমাত্র ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলেই সম্পন্ন হতে পারে।···

"সুদীর্ঘ তিন চার বছর সন্দেহ ও প্রশ্নের দোলায় দুলতে দুলতে আমি ক্রমশ বাবার এই ক্রিয়াগুলিকে এযাবৎ আবিষ্কৃত নিয়মের আওতার বাইরে অন্য কোন শাস্ত্রের নিয়মাধীন বলে মেনে নিয়েছি। বিজ্ঞান বিভিন্ন আবিষ্কার করে যেমন আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে তেমনি আমাদের অজ্ঞানতা সম্পর্কেও চোখ খুলে দিয়েছে।

"আগে বা পরে যখনই হোক না কেন প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রিয়জনের মৃত্যু, শোক, উচ্চাশার বিফলতা কিংবা ভাগ্যের এমন মার আসে যা আমাদের নিয়তি বলে মেনে নিতে হয় এবং সে নিয়তির নিয়ন্তা কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা। জীবনের সেই ব্যর্থতার ও হতাশার মুহূর্তে লোকেরা বাবার কাছে ছুটে এসেছে। এক অসাধারণ উপায়ে তিনি তাদের ব্যথায় প্রলেপ দিয়েছেন, তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন। বহু উদ্ধত নাস্তিক মনোভাবাপন্নকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভাবাবেগে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। তাদের কেন সে অবস্থা হয়েছে তা তারা নিজেরাই জানে কিন্তু তাদের সেই উদ্ধত নাস্তিকতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। প্রতিদিন শত শত লোককে বাবা সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়েছেন—সর্বশেষ লোকটিও তাঁর সঙ্গে দেখা করে যখন বাইরে এসেছে তখন দেখেছি এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও সুখে তার মন ভরে গেছে। আমি নিজে যদি এক নাগাড়ে কোন দিন দশজন লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি অষ্টম বা নবম ব্যক্তি আমার কাছে অকারণে দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকে। এত অসংখ্য লোকের অন্তরে আনন্দ ও সুখের অনুভাবনা জাগিয়ে তোলা নিঃসন্দেহে অপার্থিব ক্ষমতার ব্যাপার!…

"বাবার এই অলৌকিক ক্ষমতা, দুঃস্থ-শোকার্তকে সান্ত্বনা দেবার পদ্ধতি, সকলকে শান্তি ও সুখের সীমানায় পৌছে দেবার আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে আমাদের ক্ষুদ্র সাধারণ বুদ্ধিতে বিচার করা কোন দিন সম্ভব হবে না।"*

[*মূল প্রবন্ধটির অংশ-বিশেষ আমরা গ্রহন করেছি।]

দশ

অনেকেই পরামনোবিজ্ঞানের এই গবেষণাকে অবাস্তব ভিত্তিহীন বিষয়ের অথবা ভ্রান্ত ধারণার অনুশীলন বলে উপেক্ষা করেছেন। নির্দ্ধারিত কোন পাঠক্রম বা বিষয়সূচী না থাকায় পরামনোবিদ্যার গবেষকেরা তাঁদের কাজের কোন উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখাতে বা তাৎক্ষণিক ফললাভ করতে পারেন নি। বিষয়টি নিয়ে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

পূর্বের অধ্যায়গুলিতে জন্মান্তরবাদের অজস্র কেস হিস্ট্রি আলোচনা প্রসঙ্গে সম্ভাব্য বহু প্রশ্নেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিন্তু সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার জন্য এই অধ্যায়ে প্রধান প্রশ্নগুলি নির্বাচন করে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচনা করে লেখা হয়েছে। আশা করা যায় পাঠকেরা তাঁদের সকল প্রশ্নের জবাব এতে খুঁজে পাবেন।

এক ॥ জন্মান্তরের বা ভবিষ্যৎ অনুভাবনার ঘটনাগুলি প্রকৃত পক্ষে কিছু বাস্তব না নিছক কল্পনা প্রসূত ?

ঃ ঘটনাগুলি সত্য এবং বাস্তব। কিন্তু কি করে যে হয় তার সঠিক কারণ এখনও আবিষ্কার করা যায়নি।

দুই ॥ ভারতবর্ষে এধরণের ঘটনা অন্য দেশের তুলনায় এত বেশী কেন ?

ঃ জন্মান্তরবাদ বিষয়টি ভারতবর্ষে নূতন কোন কথা নয়। আমাদের বিভিন্ন ধর্মে (হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন) এর স্বীকৃতি আছে। আমরা সংস্কারগতভাবে বিশ্বাস করি মানব আত্মার পুনর্জন্মের ব্যাপার। বিশ্বাসের মূল্য যথেষ্ট। বিশ্বাস অনেক সময় অনেক অভাবনীয় ঘটনা ঘটাতে পারে।

সংগৃহীত প্রায় ছ'শ ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মথুরার

আশেপাশে দু'শ মাইল পর্যন্ত অঞ্চল, মধ্য আরব, তুরস্ক, লেবানন ড্রুধ্ প্রভৃতি জায়গায় এ ধরণের ঘটনার খবর সব থেকে বেশী পাওয়া গেছে। মোটামুটিভাবে এসব দেশের লোকেরা জন্মান্তর-বাদকে স্বীকার করে।

তবে যে দেশেও ধর্ম বা লোকেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করে না সেসব দেশেও পুনর্জন্মের অনেক খবর পাওয়া গেছে। যথা দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি।

তিন॥ বিশ্বাসের উপরেই যদি জন্মান্তরের স্মৃতি স্মরণ রাখা যায় তাহলে ব্যাপারটাতে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনার সম্ভাবনা বেশী নয় কেন?

ঃ কল্পনার সুযোগ থাকলেও তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে দেখা গেছে ঘটনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে জন্মান্তরবাদকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। তবে অত্যধিক বিশ্বাসীরা অনেক সময়ে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার-গুলিকেও নানা কল্পনাপ্রসূত ঘটনা পরম্পরায় যুক্ত করে জন্মান্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আবার এর বিপরীত অবস্থাও আছে। ডেনমার্কের একটি ঘটনার ইতিহাসে আছে, ওখানকার একটি বাচ্চা মেয়ে প্রায়ই 'ফিলি ফিলি' উচ্চারণ করতো। পরে একটু বড় হলে সে জানায় যে আগের জীবনে সে ফিলিপাইনে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেখানে তার ঘর বাড়ী আছে। তারা খৃষ্টান ধর্মের ক্যাথলিক সম্প্রদায়েব লোক। ক্যাথলিকরা জন্মান্তর বিশ্বাস করে না। মেয়েটির বাবা-মা প্রথমে বিষয়টিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। পরে মেয়েটির কাছ থেকে অন্য বিভিন্ন তথ্য নিয়ে দেখা যায় তার সকল বিবরণই সত্য।

চার॥ জন্মান্তরের ঘটনাগুলির চরিত্রেরা পূর্ব জীবনে এবং বর্তমান জীবনে নিকটবর্তী দেশে জন্মগ্রহণ করে কেন?

ঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুই জন্মের স্থানের দূরত্ব কাছাকাছি হলেও সকল ক্ষেত্রে ব্যাপারটি প্রযোজ্য নয়। বহু ঘটনায় দেখা যায় দুটি জন্মের স্থান বিভিন্ন দেশে হয়েছে। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির

সমধর্মিতা স্মৃতিকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। এবং সমগোত্রীয় ও সমান্তরাল বিষয় বস্তু অতীত স্মৃতি জাগরিত করতে সহজাত সুযোগ এনে দেয়। Laws of association—অনুভাবীর অতীত জন্মের ইতিকথা স্মরণে বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। একটি আমেরিকান মেয়ের পক্ষে শুক্তো বা সজনে ডাঁটার চরিত্রকে বর্ণনা করা সম্ভব নয় কিন্তু ও দুটি জিনিস অন্যত্র কোথাও খাদ্য হিসেবে দেখলে বা নিজে গ্রহণ করলে সে হয়তো সেই সূত্রপথে অতীতে বাংলাদেশে জন্মের ইতিহাস স্মরণে আনতে পারতো। আজ সে সম্ভাব্য বিগত জীবন স্মরণ করতে পারলেও সেদেশের এই আচরণ ও জীবন-যাপন প্রণালী সে হয়তো বর্ণনা করে বোঝাতে পারবে না এবং তার স্বজাতি শ্রোতারাও বুঝতে পারবে না।

গত আগষ্ট মাসে পাঞ্জাবের একটি মেয়ে প্রথম আমেরিকা দেশের গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ বলতে থাকে সে নিউইয়র্ক শহরে অনেক কাল ছিল। পরে সে প্রায় পঁচানব্বইটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়। সেগুলো সে নাকি বিগত জীবনে জানতো অথবা ব্যবহার করতো। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েটিকে নিয়ে নিউইয়র্ক শহরে যান এবং সেখানে তার প্রতিটি বিষয়ই মিলে যায়। আমেরিকার গল্প না উঠলে হয়তো মেয়েটি আরো অনেককাল তার অতিমনের অস্তিত্বের খবর জানতে পারতো না।

আমেরিকার শ্রীমতী রোজেনবার্গ প্রায়ই, 'জৈন' 'জৈন' কথাটি বলতেন কিন্তু কথাটির তিনি নিজে কোন অর্থ করতে পারতেন না এবং অন্যরাও কেউ বুঝতে পারতো না। ভদ্রমহিলা আগুনকে ভীষণ ভয় করতেন। এবং তাঁর হাত-পায়ের আঙুলগুলির চেহারা দেখলে মনে হত অতীতে অগ্নিদগ্ধা হয়েছিলেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি কখনো সামান্যভাবেও আগুনে পোড়েননি। পরে কোন একদিন অন্যত্র কোথাও ভারতবর্ষের জৈনধর্ম নিয়ে কিছু আলোচনা শোনার পর তাঁর বিগত স্মৃতি স্মরণে এসে যায়। জানা যায় উত্তর প্রদেশের ইটাহ জেলায় কোন জৈন

পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

পাঁচ ॥ জন্মান্তরে অনুভাবীর লিঙ্গ পরিবর্তন হয় কিনা ?

: যদিও আমাদের বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রে আছে যে জন্মন্তরে লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না কিন্তু বাস্তবে তা হতে পারে। এমন বহু ঘটনা জানা গেছে যাঁরা পুর্বে পুরুষ ছিলেন পরে নারীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন। তবে এর কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, থাকলেও এখনও জানা যায়নি কি কি কারণে এ-ধরণের লিঙ্গ পরিবর্তন হতে পারে। এই লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনাগুলিকে 'ইলাইট' (Ilait Cases) বলা হয়ে থাকে।

পুরাণে উল্লেখ আছে একবার কোন একটি উদ্যানে হর-পার্বতী খেলা করছিলেন। পার্বতী শিবকে অনুরোধ করেছিলেন সেখানে যেন অন্য কোন পুরুষ না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করতে। ঘটনাক্রমে ইল রাজা উদ্যানে প্রবেশ করে ক্রীড়ারত হর-পার্বতীকে দেখে ফেলেন এবং শিবের ব্যবস্থা মত তৎক্ষণাৎ তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। 'ইলাইট' কথাটির জন্ম এই ঘটনা থেকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পুনর্জন্মের নানা প্রকারের কাহিনী-গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ (Classification) করার ব্যাপারে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। এটি তাঁর নিজস্ব অবদান। তাঁর মতে সাধারণত চৌদ্দ রকমের বৈশিষ্ট্য এরূপ লিঙ্গান্তরের কারণ হতে পারে। নিচে তার কয়েকটি দেওয়া হল :

Yogite—যোগীদের ও উচ্চ অধ্যাত্মবাদীদের ঘটনা।

Abhimanyuite—বিভ্রান্তিকর স্মৃতির ঘটনা।

Gokarnite—জন্মচিহ্নসহ জন্মান্তরের ঘটনা।

Shankarite—একদেহ থেকে অন্যদেহে অনুপ্রবেশের ঘটনা।

Naradite—মিথ্যা ও আরোপিত ঘটনা।

Bhriguite—ভৃগু-সংহিতার কাহিনী অনুসারী ঘটনা।

Vishnuite—জন্মান্তরের যে কোন সাধারণ ঘটনা।

Matswaite—জীবজন্তুতে জন্মগ্রহণের ঘটনা।

Ilatite—যৌন পরিবর্তনের কাহিনী।

Vyasite—জন্ম থেকেই অত্যাশ্চর্য প্রতিভার অধিকারীর ঘটনা।

Balaite—আত্মার দ্বারা প্রভাবিত ঘটনা।

Bridite—সম্মোহনের দ্বারা প্রভাবিত ঘটনা।

Sanjaite—বাস্তব উপায় ছাড়াও অন্য উপায়ে স্মৃতি স্মরণের ঘটনা।

ছন্ন॥ মনুষ্যেতর জীবন থেকে মানবরূপে জন্মগ্রহণ সম্ভব কিনা ?

: এধরণের ব্যাপার হতে পারে। জীবজন্তু থেকে জন্মান্তরে মানবজীবন গ্রহণের কাহিনী আছে। এধরণের ঘটনাগুলিকে 'মৎস্যাইট' বলা হয়। বিষ্ণুর মৎস্য অবতাররূপে দেহান্তরিত জন্ম-গ্রহণের পৌরাণিক গল্পের সূত্র থেকে সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়।

সাত॥ এই জন্মান্তরের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান সাধারণত কতটা হতে পারে ?

: সংগৃহীত বিবরণ থেকে এর সঠিক বা নির্দিষ্ট কোন নীতি পাওয়া যায় না। এবং বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করেও আজ পর্যন্ত দুই জন্মান্তরের মধ্যের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কিত প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর জানা যায়নি। একদিন থেকে সুরু করে একশ বছরের তফাতে পুনর্জন্ম হয়েছে বা হতে পারে। আবার এমন ঘটনাও আছে যখন কিনা মৃত্যুর পূর্বেই আত্মার পরবর্তী জন্ম হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জসবীরের ঘটনাটি এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

এধরণের ঘটনাকে 'শঙ্করাইট' বলা হয়। যুগাবতার শঙ্করাচার্য মঙ্গল মিশ্র নামে এক পণ্ডিতের সঙ্গে একদা তর্কযুদ্ধের পরীক্ষায় নেমেছিলেন। পণ্ডিত মিশ্র বিবাহিত, সংসারী মানুষ। পরীক্ষার সর্ত ছিল শঙ্করাচার্য পরাজিত হলে সন্ন্যাস ত্যাগ করবেন এবং

পণ্ডিত মিশ্র পরাজিত হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। পণ্ডিত পরীক্ষায় পরাজিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পণ্ডিতের স্ত্রীর অবস্থা সংকটজনক হবে বলে তাঁর স্ত্রীও শঙ্করাচার্য্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন এবং অনুরোধ করেন যে, তাঁকেও পরাজিত করতে হবে। তিনি শঙ্করাচার্যকে দেহজ-কাম ও যৌন বিষয়ক প্রশ্ন করেন। আজীবন সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের সে সব প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না। তিনি পনেরো দিনের সময় নিয়েছিলেন। নিজের দেহটিকে এক গুহায় রেখে সূক্ষ্ম শরীরে তিনি এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করেন এবং সেই পনেরো দিন ভোগ ও বাসনার মধ্যে জীবন যাপন করে কাম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলে ঘটনায় জানা যায়। 'শঙ্করাইট' সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তির ইতিহাস এটি।

আট॥ জন্মান্তরের অন্য কোন ব্যাখ্যা বা কারণ হতে পারে কিনা?

ঃ যাঁরা পুনর্জন্ম বিশ্বাসী নন বা জন্মান্তর মানতে চান না তাঁরা-এমন ঘটনাগুলিকে Clairvoyance-এর সাহায্যে সংঘটিত বলে থাকেন। যাঁরা Telepathy কিংবা Clairvoyance-এর সাহায্যে মৃত ব্যক্তির ইতিহাস জেনে পুনর্জন্মের বিবরণ বলে তেমন ঘটনাকে 'সঞ্জাইট' বলা হয়। মহাভারতের সঞ্জয় চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য এ সংজ্ঞার নামকরণের সময়ে স্মরণে রাখা হয়েছে।

কখনও কখনও সম্পূর্ণ কল্পিত বা বানানো ঘটনা জোড়াতালি দিয়ে কিছু জন্মান্তরের কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। বড় বড় মনীষী, যাঁদের জীবনকথা বিভিন্ন আলোচনার ও পুস্তকের মাধ্যমে সহজেই জানা যায় তাঁদের আত্মার পুনর্জন্মের সংবাদ বিশেষ করে রটনা হয়ে থাকে। এধরনের ভুল ও আরোপিত ঘটনাগুলিকে 'নারদাইট' বলা হয়। পুরাণোক্ত নারদ মুনির বিভ্রান্তি ঘটিয়ে বেড়ানোর পারদর্শিতা থেকে সংজ্ঞাটির নামকরণ হয়েছে। ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের সংগৃহীত বিবরণীর মধ্যে দুই বা ততোধিক গান্ধী, জহরলাল বা কেনেডি বলে কথিত ঘটনার ইতিহাস আছে।

প্রশ্ন। স্মরণ শক্তি মস্তিষ্কের অবলম্বনে থাকে। মৃত্যুতে শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্কের যখন বিনাশ হয় তখন মৃতের স্মৃতিশক্তি কি করে বেঁচে থেকে এবং অন্য জীবিতের মধ্যে জাগরুক হয় ?

: জড় জগতে চেতন অচেতন সকল বস্তুই গতি, সময় ও পদার্থের (Space, Time & Mass) নিয়মাধীন বলে সাধারণভাবে সব-কিছুই ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত বা বিনষ্ট হয়। কিন্তু গতি, সময় ও পদার্থের চিরাচরিত নিয়মের রাজত্বের বাইরে যদি কিছু বিদ্যমান থাকতে পারে তাহলে তার ধ্বংস বা রূপান্তরিত না হবার সম্ভাবনাই বেশী। স্মৃতি ও স্মরণশক্তি মস্তিষ্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বটে তবুও তার একটা স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে। আমাদের দৃষ্টি শক্তির (*Vision*) সঙ্গে তুলনা করে ব্যাপারটা বোঝান চলে। আমরা যখন জেগে থাকি তখন চোখের কতকগুলি স্নায়ু সক্রিয় থাকে বলেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু অনেক সময় এমনও হয় যে আমরা জাগ্রত অবস্থায় চোখ মেলে আছি এবং চোখের দৃষ্টিবাচক সব স্নায়ুগুলি কাজও করে চলেছে তথাপি অন্যমনস্কতার জন্য অথবা চিন্তান্বিত থাকার কারণে সামনের দৃশ্যমান কিছুই দেখতে পাই না। অর্থাৎ স্নায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়েও এক্ষেত্রে দৃষ্টি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বাধীন সত্তাধারী।

অতিমনের অধিকারী যখন টেলিপ্যাথি বা স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শনের (Clairvoyance) সাহায্যে অন্যের চিন্তাধারা অনুভব বা দূর দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা উপলব্ধি করেন সেই সময়ে মন ক্ষণিকের জন্য হলেও স্থান-কাল-পাত্র এবং গতি, সময় ও পদার্থের নিয়ন্ত্রণা-ধীনের বাইরে যদি থাকতে পারে তাহলে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্যেও তার দেহাতীতভাবে বিরাজমান থাকা সম্ভব।

তাছাড়া মৃত্যুতে যে স্থূল দেহের বিনাশ হয় তার পরেও এক সূক্ষ্ম শরীরের, সেটাকে প্রাণ আত্মা বা অন্য যা কিছুই বলি না কেন, অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা আছে। আমাদের ধর্ম এই সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থিতি স্বীকার করে এবং পরামনোবিদ্যা ধর্মর এই স্বীকৃতিটিকে

সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে। স্মৃতি হয়তো এই সূক্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করে অনির্দিষ্টকাল জীবিত থাকে।

দশ ॥ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের সঙ্গে তুলনায় জন্মান্তর বা অতিমনের ঘটনা এত কম কেন ?

ঃ খুব যে কম একথা বলা চলে না। এধরণের সকল ঘটনাকে একটি মূল কেন্দ্রে বা বিভিন্ন কেন্দ্রে একত্রিত করার বা কোন প্রামাণ্য বিবরণী তালিকা প্রস্তুত করার কোন ব্যবস্থা এযাবৎ ছিল না। অতি সম্প্রতি এর চর্চা শুরু হওয়ায় তবু বহু ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় কার কাছে খবর পাঠাতে হবে তা জানা না থাকায় এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ হারিয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার ব্যক্তিগত লজ্জায় বা অপরের কাছে উপহসিত হবার ভয়ে এধরণের খবর জানাতে চায় না।

শোনা যায় যে মোঘল সম্রাট আকবর নিজে জন্মান্তরের কথা অন্তরঙ্গদের কাছে বলেছিলেন। তিনি নাকি পূর্বজন্মে এলাহাবাদ নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে রাজা হবার জন্য তিনি ধ্যান-যজ্ঞ-তপস্যা প্রভৃতি করেছিলেন। কিংবদন্তী যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের এ ধরণের মোহ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলে শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজা হয়েছিলেন। এই কারণেই সম্রাট আকবর অন্য মুসলমান নৃপতিদের তুলনায় হিন্দু ধর্মের প্রতি যথেষ্ট উদার ছিলেন কিনা কে বলতে পারে! কিন্তু এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে আকবরের সময়েও জন্মান্তরের কাহিনী ছিল কিন্তু তার কোন ইতিহাস রাখা হয়নি বলে আজ তাই আর তা আমরা জানতে পারি না।

আমাদের অনেকেরই নূতন কোন জায়গায় বেড়াবার সময় জায়গাটা পূর্ব পরিচিত কিম্বা আগে যেন এসেছি বলে মনে হয়। সেখানকার অনেক কিছুই চেনা চেনা লাগে। মনের এই বিশেষ একাত্মবোধকে 'ডিজাভ্যু' (Disavu—the feeling of being there) বলা হয়, মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় সাতজনের এ ধরণের বোধ হতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও পুরাণ এবং ইতিহাসে জন্মান্তরের স্বীকৃতি থাকায় জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গটি মোটামুটি সকলেই মেনে নেন এবং বহু ভূঁয়ো উদাহরণ ও কাহিনী বিনা পরীক্ষায় গৃহীত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের ধর্মে ও বিশ্বাসে জন্মান্তরের স্বীকৃতি না থাকায় যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ জন্মান্তরের কাহিনীও আজগুবি হিসেবে উপেক্ষিত হয়ে থাকে।

নিজের পূর্ব জন্মের কথা বলতে পারে এমন বহু শিশু ও নরনারীর খবর পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া গেছে। জন্মান্তরবাদ সত্য না মিথ্যা এ প্রশ্নের সমাধান বিচার বিবেচনার বিষয়। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যাতীত কেস হিস্ট্রির বিবরণ বিশ্বের নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পরামনোবিদ্যা সর্বত্রই রীতিমত আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কাছে এ পর্যন্ত এধরণের প্রায় ছ'শ বিচিত্র ঘটনার বিবরণ লেখা আছে এবং এখন প্রায় প্রতি সপ্তাহে গড়ে চারটি করে ঘটনার বিবরণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর দপ্তরে আসছে।

এগার ।। ব্যবহারিক জীবনে এই গবেষণার মূল্য কি ?

ঃ মনকে খেলাবার জন্য পরামনোবিজ্ঞানীরা সাধারণত তিনটি উপায় অবলম্বন করে থাকেন। সম্মোহন (Hypnosis), ওষুধ (Drug) এবং যোগ (yoga)।

সম্প্রতি এখানে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের অতীত স্মৃতি স্মরণে আনার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। পদ্ধতিটির নাম হিপনটিক রিগ্রেসান (Hypnotic Regration—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। এর দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে তার বর্তমান বয়সের থেকে আরম্ভ করে পূর্ব বৎসরের কথা প্রথমে মনে করিয়ে দিয়ে ক্রমশ এক বছর এক বছর করে পেছনের স্মৃতি মনে করান হতে থাকে। এইভাবে এক সময়ে তার জন্মকালের ঘটনা সে বলতে থাকে এবং এর পরেই জন্মপূর্ব অর্থাৎ সম্ভাব্য বিগত জীবনের ঘটনাও তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়।

এই পরীক্ষাটি কার্যকরী হলে জন্মান্তরবাদ নিয়ে আমাদের যে আধ্যাত্মিক কুয়াশাময় কল্পনা রয়েছে তা অপসৃত হবে। জন্মান্তর পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হবে ও সাধারণ প্রায় সকলেই বিগত জীবনে কি ছিলেন অথবা কি ধরণের জীবন অতিবাহিত করেছেন, জীবনের মান (Standard of living) কেমন ছিল কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর কাজে দক্ষতা বা অনুরাগ ছিল জানতে পারবেন।

অতীত সম্পর্কে এই জ্ঞান আহরণের পর আমাদের দেশে সামাজিক বিপ্লব ঘটা আদৌ বিস্ময়কর হবে না। কেননা অতীত জীবনের সঙ্গে বর্তমান জীবনের তুলনামূলক বিচারের একটা সুযোগ আমরা পেতে পারি। পরে তাতে যদি এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে গত জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি বর্তমান জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকে (যদিও আমাদের ধর্মশাস্ত্রে সে কথাই বলা হয়েছে) তাহলে সকলেই জীবনের প্রতি ও ব্যক্তিগত কর্মের প্রতি এক ভিন্নতর দৃষ্টি নিয়ে দেখতে সুরু করবেন। তাতে বিবিধ সুফল ঘটারই সম্ভাবনা।

বর্তমান ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই গবেষণার মূল্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক স্যার এ্যালিষ্টর হার্ডি বলেন, পরামনস্তাত্ত্বিক গবেষণা মানব জীবনের ভবিষ্যৎকালের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের জীবনধারণ বস্তুকেন্দ্রিক সূত্রের দ্বারা পরিচালিত কিনা সেই বিচারের উপর আগামী কালের সভ্যতার প্রকৃতি নির্ভরশীল।

যোগ সাধনা ও পরামনোবিদ্যা

যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কলাপে আমাদের দেশে সাধুসন্তেরা অনেকেই নানাবিধ আলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। যাঁরা পরামনোবিদ্যার বিষয়বস্তু তাঁদের অতিমন বা অপ্রাকৃত ক্ষমতা এক সহজাত ক্ষমতা। কিন্তু যোগ সাধনার মাধ্যমে যে অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সংঘটিত হয় তার শক্তি বা ক্ষমতা অর্জিত জ্ঞান মাত্র এবং

যথা নিয়ম-নিষ্ঠায় ধারাবাহিকতা পালন না করলে সে ক্ষমতার বিনাশও হয়ে থাকে। মূল কিছু প্রভেদ থাকলেও পরামনোবিজ্ঞানে ভারতীয় যোগশাস্ত্র অনুধ্যেয় বিষয়। কারণ, যোগাভ্যাস সাধনায় বা অনুশীলনে শরীরের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কতকগুলির উপর প্রভাব জন্মায় এবং তা থেকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু এই নূতন গবেষণা কেন্দ্রে যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় যে যাঁরাই যোগাভ্যাস করবেন তাঁরা মানসিক কিছু অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হবেন তাহলে ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সঙ্গে অবাস্তব ক্রিয়াকলাপের যে কুয়াশাচ্ছন্ন সম্পর্কের কোন সমাধান এতকাল করা সম্ভব হয়নি তার পথনির্দেশ পাওয়া যাবে। পরা-মনোবিজ্ঞান এদিক দিয়ে এক নূতন দিগন্তের প্রতি আলোকপাতে পথিকৃৎ হবে। যোগাভ্যাসের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অনেকগুলি কেন্দ্র আমাদের দেশে থাকলেও যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরামনোবিদ্যার যোগাযোগের যে সম্ভাবনা থাকতে পারে তার উপযুক্ত গবেষণা করার কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এতকাল আমাদের ছিল না।

ছাত্রারপুরের স্বর্ণলতা, চাঁদগাড়ীর মুনেশ অথবা আগ্রার মঞ্জুলতা প্রভৃতি যাদের বর্তমান জীবনের কাহিনী ও অতীত জন্মের ইতিকথা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বলা হয়েছে সেগুলো ঘটনা বৈচিত্র্যে সাধারণ জনমানসে ছাপ ফেললেও বিজ্ঞান-সমাজ সহজে এর মনস্তাত্ত্বিক জটিল গবেষণা সাপেক্ষ দিকটি স্বীকার করেনি।

আধ্যাত্মিক সাধনার যোগসূত্র

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে কি নেই এই মূল প্রশ্নের উপরেই ধর্মের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। কেন না ঐশ্বরিক শক্তির উপস্থিতি মেনে নেবার পরই বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি এবং প্রসারতা সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা আধ্যাত্মিক শক্তির উপস্থিতিকে অস্বীকার করলে সকল ধর্ম আচরণই অর্থহীন হয়ে যায়।

বিজ্ঞান-সাধনা ও আধ্যাত্মিক ধর্ম চেতনার যে সহজাত সংঘাত

ধারাবাহিক কাল থেকে চলে আসছে তারই যোগসূত্র বা মিলনের সেতুবন্ধন সন্ধানে পরামনোবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণার উৎপত্তি। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এই মৌলিক আদর্শগত সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞানগ্রাহ্য ব্যাখ্যার খোঁজে অনুশীলন করছেন।

জড়বাদী বিজ্ঞান সৌরজগতের সব কিছুকেই কাল, গতি ও পদার্থের বিভিন্ন সূত্রের পরিচালনাধীন বলে মনে করে এবং তার মধ্যে কোন প্রকার অদৃশ্য কার্যকারণের প্রভাব মানতে রাজী নয়। পরামনোবিজ্ঞান বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত করেছে টেলিপ্যাথি, জন্মান্তরের স্মৃতি স্মরণ, স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিগুলি কাল, গতি ও পদার্থের ব্যবহারিক নিয়মের আওতার বাইরে স্বয়ংনির্ভর স্বাধীন সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু কিছু ব্যক্তি বিশেষের উপর পরামনোবিদ্যার গবেষণায় যে ফল পাওয়া গেছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের পরিচিত পরিধিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় মানবজীবনে কিছু কার্যকারণ জাগতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে ঘটে চলেছে। এই কার্যকারণগুলিকে আধ্যাত্মিক নিয়মে পরিচালনাধীন বলে আমাদের মেনে নেওয়া চলতে পারে।

এই দুরূহ ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কিছু নূতন সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা থেকে পাওয়া সম্ভব। এদের এই গবেষণা ধর্মতত্ত্ববিশ্বাসী মানব সমাজকে, অদূর ভবিষ্যতে এমন অস্ত্রে বলীয়ান করবে যে, তার কোন জবাব জড়বাদী বিজ্ঞানের দেওয়া সম্ভব হবে না। ধর্মের বিচিত্র বিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে কুহেলিকাময় রহস্যের সব কিছুই তখন একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।